ভেজাল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ভেজাল

চিহ্ন

মানিক বন্দোপাধ্যায়



সিগ্‌নেট প্রেস
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৩৫১

—প্রকাশক—

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগ্‌নেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড কলিকাতা

—প্রচ্ছদপট—

সত্যজিৎ রায়

—ছবি—

সূর্য রায়

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

শিবরাম দাস

—মুদ্রাকর—

শশধর চক্রবর্তী

কালিকা প্রেস লি:

৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট কলিকাতা

—বাঁধিয়েছেন—

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৫০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট কলিকাতা

*

দাম আড়াই টাকা

প্রকাশকের কথা

মানিকবাবু শক্তিমান লেখক। তবু তাঁর সম্বন্ধে এ বিশেষণটা যথেষ্ট শক্তিশালী হল না! আরো বেশি করে বলা উচিত। বেশি করে বলতে না পারার দরুন সংক্ষেপে বলতে হয়, তিনি অসাধারণ। তার অর্থ এ নয় যে তিনি অস্বাভাবিক। বরং মানুষের প্রকৃতিতে যা গোপন ও গহননিহিত, দুশ্ছেদ্য ও দৃঢ়লগ্ন, সহজাত ও অভ্যাস-অধিগত, তাকেই তিনি উদ্‌ঘাটন করে দেখান। তাই তাঁর দৃষ্টিটা সহজ ও সাধারণ দৃষ্টি নয়, সত্য দৃষ্টি।

জীবনের একটা বাঁ দিক আছে। যে দিকটা মানুষ ঢেকে রাখে তার ঐশ্বর্য-বিলাসে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, পরিবেশ-প্রশাসনে ; যে দিকটা প্রচ্ছন্ন, হয়তো বা কর্দমাক্ত। বাইরে যেটা ত্যাগ, ভিতরে সেটা যাচ্ঞা ; বাইরে যেটা উৎসর্গ, ভিতরে সেটা লুব্ধতা। মানিকবাবু শুধু ঘরই দেখেন না, তার সিঁড়ির খবর নেন, ঘরের আগম-নির্গমের খবর। বহু বৎসরের ধুলোর উপর জমকালো গালচে পাতা হয়েছে, কিন্তু ড্রয়িং-রুমের সত্যিকার বর্ণনা করতে গিয়ে ধুলো বাদ দিলে বর্ণনাটাই ভুয়ো হয়ে যাবে। ডান হাত যখন দান করে তখন সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ হাত যে ক্ষতিপূরণের ফিকির খোঁজে, সে খবরটা মানিকবাবু ধরে ফেলেছেন। এক হাতের সেবার পাশে আরেক হাতে যে দীন অনুনয় থাকে উন্মুখ হয়ে সেটা একটু বাঁয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখা যায়। দেখা যায়, বিরহে ডান চোখ অশ্রুপাত করলেও বাঁ চোখ রেহাই পাবার আনন্দে চকচক করছে। দেখা যায়, যা ফাঁপা তাই লেফাফাদুরস্ত হয়ে সমাজে সংসারে

হেঁটে বেড়াচ্ছেন। কাপট্যের তকমা পরেই যত কিছু পারিপাট্য।, বাইরে যা শোভা ও শান্তি, সেটা পেষণ ও শোষণেরই প্রকারান্তর। ডান চোখ দেখে শুধু মসৃণ চামড়া, সুগোল মাংস, কিন্তু বাঁ চোখ দেখে হাড়গোড়, মূল-মজ্জা, নাড়ীচক্র। যা আপাতদৃশ্যমান সেটা ডান চোখের, আর যা পরিণাম-প্রামাণিক তাই বাঁ-র। সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে ডান চোখ এই দেখে এসেছে চিরকাল, পৃথিবীর ঘোরাটা বাঁ-চোখের আবিষ্কার। বাঁয়ে থেকে দেখেন বলে সন্দেহ হতে পারে এটা বোধ হয় মানিকবাবুর বাঁকা করে দেখা। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মাঝেই যে অন্তর্নিহিত একটা বিকৃতি আছে, ভিয়েনের মধ্যেই ভেজাল, যেটা ধনতান্ত্রিক সমাজ ও কৃত্রিম সভ্যতার তৈরি, সেটা যিনি দেখতে পেরেছেন তিনি সম্পূর্ণ করেই দেখেছেন বলে মেনে নেব।

মানিকবাবু শাখার নন, শিকড়ের। যোগবিয়োগ গুণভাগের নন, লঘুকরণের। এই গল্পগুলি তাঁর জীবনদর্শনের বিশেষবোধক। কতখানি খাদ মিশিয়ে সোনা, গাদ মিশিয়ে মধু ও ক্লেদ মিশিয়ে রূপ তারি তিনি নির্ভুল ফর্মুলা কষে দিয়েছেন। মানুষের জীবনে প্রকাশ্যের চেয়ে প্রচ্ছন্নের ব্যঞ্জনা যে অনেক গভীর, তার সমস্ত গতি-বিরতির যে ব্যাখ্যাটা সহজগ্রাহ্য তারও চেয়ে যে একটা দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যা আছে তার অবচেতনায়, তার সমস্ত সারল্য যে দুর্বোধ এক কুটিলতার কুণ্ডলী, তার সমস্ত প্রেরণা আসছে যে ঊর্ধ্বস্থ আকাশ থেকে নয়, আদিম ও মৌল মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে, তারই উদ্‌ঘাটন এই গল্প-গুলিতে। আর, এই বলা ও দেখা কি আশ্চর্য মিলেছে তাঁর সজাগ শিল্পবোধের সঙ্গে। ভঙ্গির সঙ্গে মিলেছে আঙ্গিক, বিষয়ের বক্রতার সঙ্গে মিলেছে ভাবার তীক্ষ্ণতা। আর, যা সূক্ষ্ম তাই তীক্ষ্ণ। যা সত্য তাই রূঢ় ও নির্মম।



ভয়ংকর

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

অসময়ে সহর থেকে টাকা এসেছিল, কারখানায় পৌছে দেবার জন্য ভূষণ দত্ত প্রসাদকে ডেকে সাতশো তেইশ টাকা দিল। চার মাইল দূরে বিরূপা নদীর ধারে ভূষণের মস্ত চামড়ার কারখানা। কাজ শেষ হবার পরেও আজ সকলে সেখানে ধন্না দিয়ে থাকবে, কিছু কিছু টাকা অন্তত সকলকে আজ দেওয়া চাই। নইলে কাল কেউ কাজে আসবে না। রাস্তা ধরে বীর গাঁ হয়ে কারখানায় যেতে অনেক সময় লাগে, রেল লাইন ডিঙিয়ে পেনোর মাঠ পার হয়ে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে হতে প্রসাদ কারখানায় পৌছে যাবে।

গুমোট হয়েছে। আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে, প্রসাদের চোখে পড়েছিল। বুকটা তার একবার কেঁপে গেল। ভূষণকে করুণ সুরে একবার জানিয়ে দেবে কি, ঝড় উঠবার ভয়ে বাইরে যেতে তার সাহস হচ্ছে না?

বলা দূরে থাক, ভীরু চোখ তুলে ভূষণের মুখের দিকেও একবার সে তাকাতে পারল না। প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ

বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে ভূষণের কাছে।

মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের, প্রকাণ্ড মাথায় ঠাসবুনানি কদমকেশর চুল, ফোলা ফোলা গাল, নাকের বড় বড় গহ্বর দুটি কাঁচা-পাকা চুলে ভরা। পুরাণ ইতিহাস রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি আর নির্মম কঠোরতার প্রতীক অবশ্য আছেন তার দেবতারা, কিন্তু তার মনে তাদের প্রভাবও ভূষণের মতো জোরালো নয়। ভূষণ প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। প্রতি মুহূর্তে তার অস্তিত্ব, তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

'আজ্ঞে না, যাচ্ছি।'

গেরুয়া রঙের ছোট টাইট জামাটি গায়ে দিয়ে সে টাকাগুলি ন্যাকড়ায় বেঁধে পকেটে রাখল। এতটুকু দায়িত্ব নিয়েই নিজেকে তার বিপন্ন অসহায় মনে হচ্ছে। আশাকে ইসারায় ডাকতে দেখে আরেকবার বুকটা তার কেঁপে গেল।

'জাম পেড়ে এনো আমার জন্যে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আনব।'

'মরণ তোমার আজ্ঞে হুজুর!'—আশা গা-ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, 'বৌঠান বলতে পার না?'

চেরা ঠোঁটের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দুটি ঘষা শ্বেত পাথরের মতো অনুজ্জ্বল দাঁত সবসময়েই চোখে পড়ে, কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আরেকটি দাঁতে খেলে যায় সোনালী ঝিলিক।

দাঁতটি ভেঙেছিল ভূষণ, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মতো প্রকাণ্ড চ্যাপটা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা ধরা জোয়ারের মতো অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থমথম করছে। প্রসাদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশা এই-রকম সুরু করলে শরীরটা তার শক্ত হয়ে যায়।

রাস্তার মোড়ে বসাকদের মন্দির। সামনে দিয়ে যাবার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের মানুষ-সমান উঁচু চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে প্রসাদ প্রার্থনা জানাল, আজ যেন ঝড় না ওঠে, আর—আর, তার যেন সুমতি হয়।

আশার সুমতি হোক এই প্রার্থনা জানাবার ভরসা তার হয় না, আশার মনে পাপ আছে মনে করলেও তারই পাপ হবে। আশা ভূষণের স্ত্রী, আশা গুরুজন। বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে পায়ে হাত দিয়ে আশাকে সে প্রণাম করেছিল।

আশা কাঁচা আম মাখছিল, থুতনি ধরে নেড়ে দেবার সময় ঠোঁটে আঙুল ঘষে গিয়েছে। চলতে চলতে প্রসাদ ঝাল নুন-তেলের স্বাদ অনুভব করতে থাকে। দুঃখে ক্ষোভে চোখে তার জল এসে পড়ার উপক্রম হয়। এ-বিপদ ঠেকানো যাবে না, ঠেকানো অসম্ভব। সুমতি না ছাই জাগবে তার, আশা কাছে এসে দাঁড়ালে ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়। দুটি হাত দিয়ে আশা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে কল্পনা করতে গেলেই তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে, সত্য সত্যই আশা যেদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে পাবে কোথায়?

আশা যে কেন এমন হয়ে গেল কে জানে। মাঝখানে একবার প্রসাদের নিরুত্তেজ উৎসাহহীন জীবনে একটু সাড়া এসেছিল। সখ হয়েছিল,

বিয়ে করবে। কাকে বিয়ে করতে দেখে, কার কাছে নববধূকে শয্যাপার্শ্বে পাওয়ার রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনে অথবা কার সুখশান্তি-ভরা দাম্পত্য জীবনকে হিংসা করে ইচ্ছাটা তার জেগেছিল বলা যায় না। রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরু লাজুক কিশোরী একটি বৌকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন। কমবয়সী, কুমারী, বোকাটে ধরণের এবং অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির যে-কোনো ঘরোয়া মেয়ে হলেই তার চলত। কিন্তু তার জন্য যে-কোনো মেয়েই বা কে খুঁজে দিচ্ছে! জানাশোনার মধ্যে নিজের জন্য নিজেকেই তার একটি পাত্রী ঠিক করতে হল। মেয়ের বাপ গরীব, মেয়েটি চলনসই, সুতরাং সুলভ। তিন দিনের চেষ্টায় অনেক ভণিতার পর মেয়ের বাপের কাছে ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করতে পারল। মেয়ের বাপ কৃতার্থ হয়ে বলল, 'সে তো আমাদের ভাগ্যি।'

তাকে দিয়েই প্রসাদ আবেদন পাঠাল ভূষণের কাছে। ভূষণ উদারভাবে বলল, 'তা করুক না বিয়ে, বিয়ে করবে তাতে আর হয়েছে কি!'

দুপুরবেলা তাকে ঘরে ডাকিয়ে সোহাগের কৌতুকে আশা বলল, 'তুমি নাকি বিয়ে করবে? মাগো মা, কোথায় যাব!'

সলজ্জভাবে একটু হাসলেও প্রসাদ মুখ নিচু করল না। আশাকে দেখতে দেখতে গভীর স্বস্তি বোধের সঙ্গে তার মনে হতে লাগল, তার বৌ এরকম হবে না, সুন্দর রোগা প্যাটকা চেহারা তার বৌ-হব মেয়েটার। তারপর কোথা থেকে আশার ছোটছোট কটা চোখে ঈর্ষার বিহ্বলতা ঘনিয়ে এল। ভূষণের তুলনায় এ-লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্যরকম, এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হল এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, চোখ রাঙালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায়, হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোট

ছেলের মতো, ইচ্ছা-খুশিতে আকাশে তুলে আছড়ান চলে মাটিতে।
তাছাড়া, তুচ্ছ ওঁর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না, ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। ওর বিচারের মূল্য কতটুকু! মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা না-ভাবাকে!
তবে কেমন যেন প্রাণহীন মানুষ, জড় পদার্থের মতো, সাড়া দিতে জানে না। শুধু বিবর্ণ হয়ে যায়, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দিন তিনেক নেড়েচেড়ে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আশার রোখ চেপে গেল। বিয়ের ব্যবস্থাটা দিল বাতিল করে।
মুচকে হেসে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।'
সেই থেকে এইরকম আরম্ভ করেছে আশা। এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে ভূষণ যে-রাত্রে বাড়ি থাকবে না।
কোথাও চলে যাবার কথা মাঝেমাঝে প্রসাদ ভাবে। কিন্তু কোথায় যাবে! অজানা অচেনা জগতকে সে কম ভয় করে না। ছোটখাট ফরমাশী কাজ করে, সাবধানে খেয়ে দেয়ে শরীরটা ভালো রেখে কোনো রকমে এখানে মাথা গুঁজে সে টিকে আছে। দুর্বল শরীর, এতটুকু অনিয়মে অসুখ হয়। লেখাপড়াও ভালো জানে না, কোনো কাজও শেখেনি। অপরিচিত নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়লে দুদিনে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পেনোর মাঠের মাঝখানে ভীরু প্রসাদকে ঝড় ধরে ফেলল।
পরপর কদিন বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, এলোমেলো বাতাসও উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিও নামেনি, ঝড়ও ওঠে নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ উড়ে বাতাস পড়ে গিয়েছে, দিগন্তের কোলে শুধু চোখে পড়েছে ঘনঘন ক্ষীণ বিদ্যুতের চমক। প্রসাদ প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল, আজও যেন তাই হয়। নেহাৎ যদি খারাপ হয় তার অদৃষ্ট, শুধু যেন বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টিতে ভিজলেই তার সর্দিকাশি হবে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে জ্বর এসে হয়তো শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে নিমুনিয়ায়, ভূষণের সেজ শালার মতোই হয়তো চার দিনের দিন অচেতন হয়ে সাতদিনের দিন খটখটে জ্যোৎস্নার রাত্রে অজ্ঞান অবস্থাতেই সে মরে যাবে, তবু মাঠে একা ঝড়ের মধ্যে পড়ার চেয়ে তাও অনেক ভালো।
আকাশে ধূসর কালো মেঘের দ্রুত সমাবেশের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে দুরুদুরু বুকে প্রসাদ জাম পাড়ছিল, দূর থেকে ঝড়ের সোঁ-সোঁ আওয়াজ কানে এলো কারখানার দিক থেকে। ন্যাকড়ায় বাঁধা জামের পুঁটুলি পকেটে ভরে সেদিকে পিছন ফিরে প্রসাদ ছুটতে আরম্ভ করল। কোনোমতে পেনোর মাঠ পার হয়ে রেললাইন ধরে স্টেশনে পৌঁছে যদি আশ্রয় নেওয়া যায়। দুশো গজ দৌড়লেই প্রসাদকে হাপরের মতো হাঁপাতে হয়, সুতরাং হাঁফ ধরবার আগেই বাতাসের প্রথম ধাক্কায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উঠে বসা মাত্র ধুলো আর বালিতে দুটি চোখ যেন তার অন্ধ হয়ে গেল। একটা শুকনো ঝাঁকাটির চারা গড়িয়ে এসে তার গায়ে আটকে গেল, শুকনো পাতা তার গায়ে মাথায় ক্ষণিকের জন্য লেপটে থেকে ছিটকে উড়ে যেতে লাগল, একটা শুকনো ডাল কোথা থেকে এসে লাঠির মতো আঘাত করল তার ঘাড়ে। তারপর নামল বৃষ্টি। ঝড়ের শক্তি আর কলরব যেন দশগুণ বেড়ে গেল। দুটি বুড়ো আঙুল দুকানে ঢুকিয়ে হাতের তালুতে মুখ ঢেকে প্রসাদ তখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।
ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জীবনে কখনো সে ঝড়ের মূর্তি চেয়ে ভাখে নি। ঝড় উঠলে সে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে চোখ কান

বন্ধ করে থাকে, মাঝেমাঝে মুখ দিয়ে বার হয় ভয়ের ঙ-ঙ কাতরানি। কত কালবৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় এসেছে, গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙে চারিদিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, প্রসাদের নাগাল কখনো পায়নি। আজ তাকে আয়ত্তে পেয়েই যেন নববর্ষের প্রথম কাল-বৈশাখী উল্লাসে আরও বেশি ক্ষেপে গেল। বৃষ্টিধারাকে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে গায়ে তার প্রচণ্ড বেগে ঝাপটা মারতে লাগল ক্রমাগত, চারিদিকের গাছে আর্তনাদের অসীম সমারোহ তুলে মড়মড় শব্দে ভেঙে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ছোটবড় ডাল, দূর থেকে পাঠাতে লাগল কোটি হিংস্র জীবের ফুঁসে ফুঁসে শাসানোর আওয়াজ। একটা কিশোর তেঁতুল গাছ গুঁড়ির কাছে মটকে ভেঙে আছড়িয়ে পড়ল, ডগার সরুসরু ডালপালাগুলি অসংখ্য চাবুকের মতো একসঙ্গে আঘাত করল প্রসাদের পিঠে। সেই মুহূর্তে ঠিক মাথার উপরের অবনত আকাশে প্রচণ্ড রবে গর্জন করে উঠল বজ্র।

তখন ধীরে ধীরে প্রসাদ উঠে বসল। অন্ধ ভয়ে মনে মনে সে মুহুর্মুহুঃ মরছিল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় জাগায় তার খেয়াল হয়েছে যে এখানে এভাবে পড়ে থেকে সত্যসত্যই মরা চলে না। বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। গাছের ডালের আঘাতে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা এবার বীভৎস শিহরনের মতো বারবার তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে লাগল। এত জোরে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল যে মাথাটা তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। তবু বমির বেগ ঠেকানো গেল না, দুহাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে সে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। এমন হাল্কা মনে হতে লাগল নিজেকে যে শুকনো পাতার মতো বাতাস যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কয়েক মুহূর্ত দুহাতে সে মাটি আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর উঠে দাঁড়ানো মাত্র বাতাসের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। ঝড় তাকে উঠে ফাঁকায় সরে যেতে দেবে না, এইখানে তাকে ফেলে রেখে

যতক্ষণ পারে খেলা করবে তাকে নিয়ে, তারপর গাছ চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনোদিন হয়নি। ক্রুদ্ধা প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কি না ভেবে কিছুক্ষণ সে সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না। আবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। চলতে আরম্ভ করে ভয়ের পরিবর্তে ভাবনায় তার বুকটা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। রূপকথার মায়াকাননের চেয়ে ভয়াবহ এই গাছের রাজ্য পার হতে পারলেই খোলা মাঠ, সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে নিরস্ত্র ঝড় তার কিছু করতে পারবে না। ফাঁকায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে কিনা ভেবে উৎকণ্ঠায় বারবার তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ গাছটি পার হবার আগেই তার চোখে পড়ল আলো। হেডলাইট জ্বালিয়ে রেললাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে প্রবল হাসিকান্নার আবেগে প্রসাদের দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে নড়তে পারল না। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেই অগভীর একটা খাদে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকু তার দুঃখ হল না, আঘাতের বেদনাও অনুভব করল না। নিজের সঙ্গে সে যেন তামাসা করছে এমনি ভাবে গোঙিয়ে গোঙিয়ে সে হাসতে লাগল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার আগে সস্নেহ পরিহাসের ভঙ্গিতে ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে বলল, 'ধুত্তোর নিকুচি করেছে, ছুটতে গেলি কেন?' হামা দিয়ে খাদের গা বেয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আবার ট্রেনের আলোর দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করল।

প্রকাণ্ড একটা গাছ ভেঙে পড়ে লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। একটি থার্ডক্লাস কামরার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রসাদ মরমে মরে গেল। একগাড়ি লোক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জামা কাপড় তার কাদা

আর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে, না-জানি কী ভাবছে সকলে তাকে দেখে! কামরার দরজা-জানালা সব বন্ধ, ভিতরে অসহ্য ভ্যাপসা গরম। প্রসাদের দম আটকে আসবার উপক্রম হল। তাড়াতাড়ি অপর দিকের দরজা খুলে সে লাইনে নেমে গেল।

বাড়িতে পৌঁছানোমাত্র ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা পৌঁছে দিয়েছিস?'
'আজ্ঞে না।'
ভূষণ কটমট করে তার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে।'
এক পকেটে ন্যাকড়া বাঁধা জাম ছিল, অন্য পকেটে ভূষণের রুমালে বাঁধা সাতশো' তেইশ টাকা। জামগুলি ছেঁচে গেছে, রুমাল শুদ্ধ টাকাগুলি কখন কোথায় পড়ে গেছে ভগবান জানেন। পেনোর মাঠেই কোথাও পড়েছে, সে যখন আছাড় খাচ্ছিল অথবা খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল।
থাবা উঁচিয়ে ভূষণ তার দিকে এগিয়ে আসে, ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে প্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে আরম্ভ করে দেয়। সে ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানে, তার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, ভূষণ তাকে মারবে! খালি পেটটা গুলিয়ে উঠে আবার তার বমি ঠেলে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরতে মাথার কাঁপুনি সুরু হয়ে যাওয়ায় চোখের সামনে ভূষণের মস্ত গোলগাল মুখখানা পাশাপাশি দুদিকে লম্বা হয়ে যায়।
কাছে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেই ভূষণের গতি কেমন অনিচ্ছুক ও মন্থর হয়ে পড়ে, খানিকটা তফাতে থেমে গিয়ে সে থাবা নামিয়ে নেয়। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখখানা দৃষ্টির ফোকাসে আনতে দাঁত খুলে গিয়ে প্রসাদের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ভূষণ ভয় পেয়েছে! তাকে মারবার জন্য এগিয়ে এসে ভূষণের ভয় হয়েছে!

'পেনোর মাঠে খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

'পাওয়া যায় ভালোই, নইলে তোকে পুলিশে দেব।'

ভূষণের ধমকে ঝাঁঝ নেই, এ যেন শুধু কথার কথা। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে এসে প্রসাদের মূর্তি হয়েছে ভীতিকর, তার লাল চোখের ভয়ার্ত চাউনি দেখে বুক কেঁপে ওঠে। আশার সখের আলমারিতে বসানো প্রকাণ্ড আয়নায় প্রসাদ নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। ভূষণ ভয় পেয়েছে, তাকে দেখে ভয় পেয়েছে, অনুমান করে প্রথমে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর ধীরে ধীরে জাগল উল্লাস, নিজেকে ভূত সাজিয়ে গুরুজনকে আঁতকে উঠতে দেখলে ছোট ছেলের যেমন উল্লাস জাগে সেইরকম, কিন্তু ঢের বেশী প্রচণ্ড ও উৎকট।

তার মধ্যেও মাথাটা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মনে হয়। ধীরে সুস্থে সব যেন সে হিসাব করতে পারছে, বুঝতে পারছে, ভুল হবার ভয় নেই। সে টের পাচ্ছে রুখে ওঠার ভঙ্গিতে সে যদি এখন দুপা এগিয়ে যায়, ভূষণ আরও ভয় পাবে, আরও সংশয়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাবে, আরও নরম গলায় কথা বলবে, হয়তো দুপা পিছিয়েও যাবে! এত ভীরু ভূষণ? এত সহজে সে ভয় পায়?

কী যে উপভোগ্য মনে হয় এই মুহূর্তগুলি প্রসাদের! শেষ করে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। আজ বিকেলেও যার কাছ থেকে ছুটে পালাবার জন্য অদম্য প্রেরণা জেগেছিল, অকারণে সাধ করে তার সামনে প্রসাদ দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলার নেই জেনেও কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভান করে বলে, 'পড়ে গেলে কি করব! গাছ চাপা পড়েছিলাম, মরে যেতাম আরেকটু হলে। তখন কারো টাকার কথা খেয়াল থাকে?'

ভূষণ ভয়-বিস্ময়ের ভান করে সহানুভূতি জানিয়ে বলে, 'গাছ চাপা পড়েছিলে? খুব বেঁচে গেছ তো!'

তখন বিজয়ী বীরের মতো প্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আশা তাকে দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'মাগো মা, একি?'

স্থাকড়ায় বাঁধা ছাঁচা জামগুলি দেখিয়ে প্রসাদ বলল, 'আপনার জন্ম পেড়েছিলাম।'

আশা চাপা গলায় বলল, 'সত্যি?'

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চলছে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে স্টোভ জেলে আশা রাঁধছে ভূষণের নৈশভোজনের মাংস। ঘরের মধ্যে গন্ধ আর গরমের অসহ্য সমন্বয়। গায়ের জামা সেমিজ সে খুলে ফেলেছে, ঘামে ভিজে সিদ্ধ মাংসের মতো তার মেটে চামড়া হয়ে গেছে স্যাঁতসেঁতে। 'একটাও ভালো নেই?' বলে মুখে পুরবার উপযুক্ত জাম খুঁজতে সে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের আলগা আঁচলটিও তার খসে পড়ল, মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল রিঙে বাঁধা একরাশি চাবি।

প্রসাদ চোখ বুজতে চায়, বুজতে পারে না। পালিয়ে যাবে ভেবে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভূষণকে ভয় দেখিয়ে যে বিদ্রোহী উগ্র আনন্দ তার জেগেছিল, এত সহজে তার চেতনা থেকে লোপ পেয়ে সে-আনন্দ তাকে যেন ঝিমিয়ে পড়তে দেবে না। মহাপাপ থেকে, অনন্ত নরক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্ম মন্দিরের দেবতাকে স্মরণ করতে গিয়ে সে শুধু দেখতে পায় কোমল মাংসে গড়া অপরূপ কাঁধ, বাহু আর বুক। আশা সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র তার ঘামে ভেজা দেহটা সে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

গভীর আলস্যে হাই তোলার মতো মুখের ভঙ্গি করে আশা বলল, 'মরণ তোমার! বাড়ি ভরা লোক নেই?'

তবু সে তাকে বুকে চেপে ধরে রাখল আরও খানিকক্ষণ। ছোটছোট

কটা চোখের বিহ্বল দৃষ্টি তার মুখে বুলিয়ে, হলুদ রঙীন আঙুলে তার কপালের এলোমেলো চুল সরিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'পড়ে গিয়েছিলে মাঠে? খুব লেগেছে?'

বিস্ময় বা উত্তেজনা আশার নেই, মদালস অচপল নারীর মতো সে যেন বহু পরিচিত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করেছে। কতটুকু সময়ই বা প্রসাদের কাটল সেই ব্যাকুলতাহীন নিবিড় আলিঙ্গনে! ভূষণকে যতটুকু সময় ভয় দেখিয়েছিল তার চেয়ে বেশী নয়। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই প্রসাদের মনে হল, আশাকে, আশার অবৈধ কামনাকে, আশার দেহকে সে চিনে ফেলেছে। এ যেন একটা রবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা। আশার এই দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা-কপাল কুটে সে আর্তনাদ করত! ঘুমের ঘোরে পাশ বালিশকে আঁকড়ে ধরার মতো তাকে আশা জড়িয়ে ধরেছে, তার মধ্যে স্বর্গমর্ত ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনা কল্পনা করে সে হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিল! আশার হৃদপিণ্ডের ধীর অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করতে করতে প্রসাদের বুকের টিপটিপানি শান্ত হয়ে গেল, ছেলেদের ভিজে চ্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তনের চাপে আগুন ধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল। প্রায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, 'সাফসুফ হয়ে নাও গে। আমার চানের ঘরে ভালো করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বড় বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।'

আশার স্নানের ঘরে গোলাপের গন্ধ, একটানা, অনিবার্য, জমজমাট গন্ধ। তিন আনা দামের একটি সাবানে এত গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়, গোলাপের আরক কত সস্তা। মনটা প্রসাদের আশ্চর্যরকম সাফ মনে হয়, ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যু ভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে

মানুষের ভয়, আশা সাফ করে দিয়েছে মাছির মতো অন্তের চটচটে দিন কামনায় আটকা পড়ার ভয়। ঘষে ঘষে সাবান মেখে প্রসাদ স্নান করল। রান্নাঘরের এক কোণে বসে ঠাকুরের পরিবেশন করা ভাত পেট ভরে খেয়ে নিল। ঝড়বাদল তখন অনেকটা কমে এসেছে। প্রসাদ সদরে গিয়ে দাঁড়াতে তাকে ভয় দেখাতেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বাতাস হঠাৎ প্রবল হয়ে চারিদিকে সাঁ-সাঁ রবে শব্দিত হয়ে উঠল। প্রসাদের নবলব্ধ সাহসও এতক্ষণে অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বাতাস অনেকটা শান্ত হয়ে এলে সে পথে নেমে গেল। রেললাইনে এখনো ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। লাইন পার হয়ে যে-পথে পেনোর মাঠ থেকে সে পালিয়ে এসেছিল সেই পথে ভূষণের দামী বড় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সে এগিয়ে চলল। টাকার পুঁটুলিটা খুঁজে পাওয়ার পরেও যদি ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, এই ট্রেনেই সে উঠে পড়বে। নয়তো ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে, যে-কোনো দিক থেকে প্রথম ট্রেনের প্রতীক্ষায়।

ভাবতেও প্রসাদের বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে কোন ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে সে গিয়ে পড়বে! তবে তার আশা আছে একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের সঙ্গে পরিচয় হলে, ভয় তার কেটে যাবে। সাতশো তেইশ টাকা মূলধন নিয়ে একটা দোকান-টোকান খুলেও সে কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না? এমন একটি বৌ-ও কি তার জুটবে না যে কিশোরী, পূর্ণযৌবনা, কয়েকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে তোলা জমকালো সংসারের গৃহিণী?



কলসী কাঁখে পাতলা ছিপছিপে একটি বৌ বেগুন ক্ষেতের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কলসীর ভারে একটু সে বাঁকা হয়ে পড়েছে। পিতলের প্রকাণ্ড কলসী, মাজা ঘষা চকচকে। বৌটির পরনের কাপড়খানি ভেজা, এখানে ওখানে গায়ে এঁটে গেছে, লটপট করছে। গড়ন পাতলা হলেও স্বাস্থ্য তার খুব ভালো। গায়ে রীতিমত জোর না থাকলে অতবড় কলসীর ভারে কোমর তার মচকে যেতে পারত।

সূর্য এখন প্রায় মাথার উপর। রোদের তাপে পায়ে-চলা সরু পথটির পাশে ঘাসে ঢাকা মাটি পর্যন্ত তেতে গেছে। ভিজে গামছা ভাঁজ করে বৌটি মাথায় বসিয়েছে।

বেগুন ক্ষেতের পরে ছোটখাট আম-কাঁঠালের বাগান। গাছে গাছে বাগানটি জমজমাট কিন্তু কেমন যেন শুকনো নিষ্ফল চেহারা গাছগুলির, কয়েকটি গাছে শুধু কাঁচাপাকা দুচারটি আম ঝুলছে। বাগানের ওপাশে টিনের চাল আর দরমার বেড়ার বাড়ি আছে টের পাওয়া যায়, গাছের ফাঁকে ভালো করে চোখ পড়ে না। বাকী তিনদিকে দূর বিস্তৃত মাঠ আর ক্ষেত, এখানে-ওখানে বাড়িঘর গাছপালার ছোটছোট চাপড়া বসানো। বেগুন ক্ষেতের চারিদিক নির্জন, দিনে-রাতে সব-সময় কারো কারো এখানে কম বেশি গা ছমছম করে।

বেগুন ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পুরানো প্যাণ্ডাসে আলপাকার উর্দি আর কোলবালিশের সরু খোলের মতো প্যাণ্টালুন পরা মাঝবয়সী একটি লোক জোরে জোরে আম-কাঁঠালের বাগানটির দিকে চলছিল। বার-বার সে বৌটির দিকে চেয়ে দেখছে। গোঁফ দাড়ি চাঁছা এবং কানের ডগা পর্যন্ত জুলপি তোলা তার লম্বা ফর্সাটে মুখে চোখ দুটি বেশ বড়-বড়, যদিও ছোট চোখ হলেই মানাতো বেশি।

বাগানে একটা কাঁঠাল গাছের নিচে সে বৌটির পথ আটকাল। পাশ কাটিয়ে যাবার পথ অবশ্য চারিদিকে অনেক ছিল। পায়ে চলা যে সরু পথটি ধরে বৌটি আসছিল সেটাও কাঁঠাল গাছটির হাত তিনেক তফাৎ দিয়েই গিয়েছে। বৌটি নিজেই সরে তার সামনে আসায় এগোবার আর পথ রইল না।

'ওমা, সুবলবাবু যে! পেন্নাম।'

'এ তোমার কেমন ব্যাভার সুখময়ী?'

'তোমারি বা এ কেমন ব্যাভার সুবলবাবু, দিন দুকুরে নাগাল ধরা?'

দুহাতে কানা ধরে কলসীটা সে নামিয়ে রাখল। যে কাঁখে কলসী ছিল তার উল্টো দিকে বেঁকে বেঁকে সোজা করে নিল কোমরটা। সুবলের ক্রুদ্ধ নালিশভরা দৃষ্টি দেখে একবার সে অপরাধিনীর মতো একটু

হাসল। অবহেলার সঙ্গে কাঁধে ফেলা ভিজে আঁচলটি নামিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আবার ভালো করে গায়ে জড়াল।

'গোড়ায় তো ডরিয়ে গেলাম, কোন্ মুখপোড়া উ কি মারছে গো? শেষে দেখি মোদের সুবলবাবু। নিশ্চিন্দি হয়ে তখন সাঁতার কেটে চান করলাম।' ফিক্ করে হেসে লজ্জায় মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার জন্যে। সত্যি তোমার জন্যে—কাল ফিরে যেতে হল তোমার!'

সুবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'কাল তো প্রথম নয়। ফিরেই তো যাচ্ছি। এলে না কেন কাল? রাত দুপুর তক্ শিরীষতলায় মশার কামড় খেলাম। মা মনসা না করুন,'—দুহাত জড়ো হয়ে সুবলের কপালে ঠেকে গেল—'সাপের কামড়ে মরব একদিন।'

সুখময়ী আপসোসের আওয়াজ করল চুকচুক, 'বালাই ষাট। কিন্তু কী করি, তেনা যে ফিরে এল গো!'

'একবার জানান দিয়ে তো যেতে পারতে, সবাই ঘুমুলে পর? ঘুরঘুটি আঁধারে একটা মানুষ হাঁ করে—'

'ঘুমিয়ে পড়লাম যে! ওনার সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'ঝগড়া হল? বেশ, বেশ! তা ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?'

'সোয়ামির সাথে মেয়েমানষের আবার কী নিয়ে ঝগড়া হয়? শাড়ি গয়না নিয়ে।'

সুবল হঠাৎ উত্তেজিত, উৎসুক হয়ে বলল, 'তুমি যত শাড়ি গয়না চাও—'

'ইস্? ফতুর হয়ে যাবেন!' ছায়ায় চাপা আলো লেগে সুখময়ীর পান খাওয়া দাঁতের ঘষামাজা অংশগুলিতে ভোঁতা ঝকমকি খেলে গেল।—'ফতুর নয় হলে। মোর তরে ফতুর হতেই তো চাইছ তুমি হাজারবার। কিন্তু শাউড়ি সোয়ামি যখন শুধোবে মোকে, অ বৌ, শাড়ি গয়না

কোথা পেলি লো, কী জবাব দেব শুনি? বলব নাকি, কুড়িয়ে পেইছি গো, ঘাটের পথে কুড়িয়ে পেইছি? তার চেয়ে এক কাজ করনা? শিরীষতলায় মশার কামড় খেয়ে তোমারও কাজ নেই, শাড়ি গয়না পরে বেড়ালে কেউ যে শুধোবে তাতেও মোর কাজ নেই—এমনি কিছু কর?'

সুবলের মুখখানা লম্বাটে হয়ে গেল।—'তা জানি, তোর শুধু গয়না শাড়িতে মন।'

'না গো না, গয়না শাড়ি আমি চাইনে। আমার মনটি তোমার।'

'তাই যদি হত সুখী—'

'হত মানে? তুমি ভাবো গয়নার লোভে তোমায় মন দিইছি। কত গয়না দেবে তুমি? কত মুরোদ তোমার? কলকাতায় নিয়ে সেজবাবু সোনায় মুড়ে রানী সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তা গিইছি আমি? আমি বলি—না, যাকে মন দিইছি তার সাথেই চুলোয় যাব, চুলোয় যদি যাই।'

'হুঁ।'

'বিশ্বেস হয় না, না? বেশ তো, চল না এখুনি যাই। এক কাপড়ে এখুনি গিয়ে গাড়ি ধরি তিনটের। তুমিও ফকির, আমিও ফকির।'

পাতার ফাঁক দিয়ে সুবলের সর্বাঙ্গে চাকাচাকা আলো আঁকা হয়ে গেছে। ভিজে গামছা দিয়ে সুখময়ী তার মুখ আর ঘাড়ের ঘাম সযত্নে মুছে দিল। কিন্তু সুবল খুশি হয়েছে মনে হল না, সুখময়ীর কাছ থেকে এরকম ছোটখাট আদর পাওয়ার বিশেষ দাম যেন নেই, পুরানো হয়ে গেছে।

'অমন যার মন হয় সে একবারটি শিরীষতলায় আসে। কাল নিয়ে চারবার ঠকালে আমায়।'

'ওগো মাগো, ঠকালাম! আমি তোমায় ঠকালাম! ভেস্তে গেল

তো কী করব আমি? হাত-পা বাঁধা মেয়েলোক বই তো নই! ঘরের বৌ, পরের দাসী, কী ধ্যামতা মোর আছে বলো? তোমায় ঠকাব, তোমার জন্মে মরণ হয়েছে আমার? কিছু ভালো লাগে না সুবলম্বান, একদণ্ড ঘরে মন বসে না। মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি। মন করে কি, দুর ছাই, ঘর-সংসার ফেলে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই।'

বড় একটা ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ সুখময়ীর মুখ ঘেঁসে কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে পড়েছে। আবেগ আর উত্তেজনায় এতক্ষণে যেন চোখ দুটি তার সেই আলোতে জলজল করে উঠল। সুবল কথাটি বলে না। উসখুস করে আর এ পা থেকে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

'দেশ গাঁ ছেড়ে দুর দেশে পালিয়ে যাই, যে দেশে কেউ মোদের চিনবে না। সব বালাই চুকিয়ে দুজনে ঘর-কন্না করি।'

'তা হয় না সুখময়ী। চাদ্দিকে বড় নিন্দে হবে, আর ফেরা যাবে না।'

'কে ফিরছে হেথা? জমি-জায়গা সব বেচে দিয়ে আমায় নিয়ে পালাবে। মোদের ফিরবার দরকার!'

'মোক্তারি করে দুটো পয়সা পাচ্ছি—'

এখানে গাছের ছায়াতে গুমোটে গরম, সুবলের কপাল ঘেমে চোখে এসে পড়তে চায়। আঙুল দিয়ে সে কপালের ঘাম মুছে মুছে ঝেড়ে ফেলতে থাকে। সুখময়ীর ভিজে চেহারায় ঘাম টের পাওয়া যায় না। আগ্রহ উত্তেজনা ফুরিয়ে গিয়ে সে শান্ত হয়ে গেছে। ঝুঁকে কাপড় তুলে সে একবার হাটুর কাছে চুলকে নিল, সোজা হয়ে হাঁটু চুলকানো আঙুলেরি একটার ডগা কামড়ে ধরল। ঘাড় তার কাত হয়ে গেল ভাবনায়।

কলসীর কানা ধরে তুলতে গিয়ে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। সুখময়ীর রাগ হয়েছে। কলসী ছেড়ে পাক দিয়ে সোজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার ফোঁস করে ফণা তুলে সাপের কামড়ে দিতে চাওয়ার মতো। কি মিষ্টি হাসিই সুখময়ী হাসল। আড় চোখে চেয়ে

চেয়ে দ্বিধা-সঙ্কোচের ভঙ্গি করে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বুক দিয়ে সে স্থবলকে গাছের অঙ্গে চেপে ধরল, মুখ উঁচু করল, স্থবলের মুখের কাছে কিন্তু পৌঁছল না। গাছে পিঠ দিয়ে স্থবল তখন কাঠ হয়ে গেছে।

'মোর চেয়ে তোমার মোক্তারি বড় হল?'

'কত কষ্টে পশার করেছি, দুটো পয়সা পাচ্ছি—'

স্থখময়ী এতক্ষণে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। স্থবল নরম হয়ে আসছে। একটি হাত তার স্থখময়ীর পিঠে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'তুমি না ফতুর হতে পার আমার জন্যে? ঘর বাড়ি জমি জায়গা বেচে ঢের টাকা পাবে, ব্যবসা করে রাজা হয়ে যাবে তুমি। রানীর মতো খাটে শুয়ে আমি হাই তুলবো, আর চাকরাণী মাগীগুলোকে হুকুম করব। চানের ঘরে তুমি আমার চান দেখবে—সত্যি দেখাব, দিব্যি গালছি।'

'আচ্ছা, তাই যাব স্থখময়ী, সব বেচে দিয়ে তোমায় নিয়ে বিদেশ যাব। কিন্তু সে তো দুচার দিনে হবে না—'

'মোক্তারি জানো বটে তুমি স্থবলবাবু। দাঁড়াও আমি আসছি কলসী রেখে।'

কাঁখে কলসী তুলতে গিয়ে স্থখময়ী আজ বোধ হয় এই প্রথম টলে পড়ে গেল। কলসীর জল শুষে নিল মাটি, আর তার ভিজে কাপড় কুড়িয়ে নিল মাটির লাল ধুলো।

'অদেষ্টে কত আছে!' বলে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভোঁতা গলায় সে বলল, 'দাঁড়াও বাবু। একটু সাবুন আনি, নইলে এ মেটে রঙ ওঠবার নয়। ফের নাইতে হবে।'

বাড়ির অঙ্গন শূন্য, ঘরের বাইরে কেউ নেই। বাইরে কেউ থাকেও না এ সময়। স্থখময়ী রেঁধে বেড়ে খাইয়েছে সবাইকে, আর কোনো কাজ

কারো নেই। রসুই ঘরের দাওয়ায় একতাড়া মাজা বাসন। ঘাটে গিয়ে বাসন মেজে এনে তবে তার কলসী নিয়ে নাইতে যাবার ছুটি হয়। কলসী ভরে জলটি আনা চাই। পুবের ঘরে নটবর হুঁকো টানছে, কথা বলছে পাড়ার কানাই ধরের সঙ্গে। শাশুড়ী শুয়েছে, নটবরের বৌ-মরা ভাই তার সঙ্গে পরামর্শ করছে আগামী বিয়ের—জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতুই আসতে মাসেক সময় নেই।

বাড়ির কুকুরটা উঠে এসে লেজ নেড়ে অভ্যর্থনা জানাতেই সুখময়ী তাকে একটা লাথি কসিয়ে দিল। আর সেই অবোধ প্রাণীর কেঁউ কেঁউ আর্তনাদ শেষ হবার আগেই রসুই ঘরের দাওয়ায় বাসনের গাদায় আছড়িয়ে পড়ে সুরু করল নিজের আর্তনাদ—একটু চাপা, একটু অস্বাভাবিক সুরে। ভয়ে তার গা কাঁপছিল।

সবাই ছুটে এল। একসঙ্গে শুধোতে লাগল, কী হয়েছে? বৌকে জড়িয়ে ধরে নটবরের মা জুড়ে দিল কান্না। কুকুরটা তখনো কেঁউ কেঁউ করে মরছে। সুখময়ীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছিল। কী থেকে কী হবে তা ভগবান জানেন, এই তার শেষ লড়াই।

সুখময়ী কেঁপে কেঁপে কেঁদে কেঁদে বলল, 'বড্ড ভয় পেইছি মা। বুকটা ধরাস্ ধরাস্ করছে। কত বলি একলাটি ঘাটে যেতে ডর লাগে, কেউ তো যাবে না সাথে। নইলে কি ওই মুখপোড়া সুবল মোক্তার—'

শুনে সবাই একসাথে চুপ মেরে গেল। ইতিমধ্যে পাশের দুবাড়ির মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসেছিল। তারাও হঠাৎ চুপ হয়ে গেল জন্ম-বোবার মতো। নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি ছাড়া কি আর করার আছে এমন একটা অসম্পূর্ণ খবর শুনে? নটবরের মা'র কান্না থেমে গিয়েছিল, প্রথমে অধীর হয়ে শুধোল, 'কি করেছে সুবল মোক্তার? অ বৌ, বল্‌না কী করেছে সুবল মোক্তার?'

'বাগানে একলাটি পেয়ে হাত চেপে ধরেছিল গো, কলসী ফেলে

পালিয়ে এইছি। ছুটতে ছুটতে আছাড় যে খেইছি কবার—হা দ্যাখো।'

দাঁতের তাবু আর কাপড়ে রক্ত-মাটি ও রক্তের দাগ সে দেখিয়ে দিল। কয়েকজনের চাপা নিশ্বাস পড়ল একটু নিরাশার সঙ্গে, কতবড় সম্ভাবনার এই পরিণতি! শুধু হাত ধরেছিল! দুপুরবেলা জনহীন বাগানে মেয়েমানুষকে নাগালে পেয়ে শুধু হাত ধরেছে সুবল মোক্তার? মামলা মোকদ্দমা হবে না, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে আজকালের মধ্যে। একি একটা ঘটনা!

তবু সবাই ছি-ছি করে, আর সুবল মোক্তারকে গাল দেয়। বাগানে গিয়ে তাকে শাসন করে আসার কথাটা কেউ ভাবেও না, বলেও না। শেষে সুখময়ীকেই ঝাঁঝ দেখিয়ে বলতে হয়, 'অ ঠাকুরপো, দাঁড়িয়ে শুধু জটলা করবে তোমরা? যাও না, দুঘা দিয়ে এসো না বজ্জাতটাকে?'

নটবরের মা বলে, 'চুপ কর্ মাগী, চুপ কর্।'

'কেন চুপ করব? আমার হাত ধরবে, তোমরা তা চুপ করে সয়ে যাবে!'

নটবর বলল, 'ও শালা কি আর আছে, পালিয়ে গেছে।'

'থাকতে তো পারে? কলসী আনতে ফিরে যাব ভেবে থাকতে তো পারে ঘুপচি মেরে? যাও না একবার, দেখে এসো।'

তখন নটবর, শশধর, নিতাই আর পাড়ার একজন সুবলকে খুঁজতে যায়, নটবরের মা চেঁচিয়ে বলে দেয়, 'কলসীটা আনিস কেউ। শুন্‌ছিস —কলসীটা আনিস।'

সুখময়ীকে ঘিরে মেয়েদের জটলা চলতে থাকে। চারিদিকে তারা খবরটা রটাবে, তবু তারাই বলে যে এমন হৈ-চৈ করা উচিত হয়নি সুখময়ীর, জানাজানি হওয়া কি ভালো! চুপিচুপি শাউড়ি বা সোয়ামিকে বললেই পারত সে, পুকুরঘাটে যাওয়ার সময় একজন কেউ সঙ্গে যেত।

সুখময়ী শুনে যায়, কথা বলে না। নটবরের মা'র চাপা আপসোস আর গালাগালির জবাবে শুধু ফোঁস করে ওঠে।

সুবলকে পাওয়া গেল কাঁঠাল বাগানেই, কিন্তু ধরে মারবার সাহস হল না একজনেরও।

নিতাই নেহাৎ বদরাগী মানুষ, সে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'বৌ-ঝির হাত ধরে টানা কেন মোক্তারবাবু?' সুবল রেগে বলল, 'তোর তো বড় বাড় হয়েছে নিতাই, যা মুখে আসে তাই বলিস!' শশধর মৃদুভাবে সাবধান করে দিল, 'আর যেন এ-সব না ঘটে মোক্তারবাবু।'

সুবল আর কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে গেল। মুখখানা তার একটু ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। সুখময়ী ফুরিয়ে গেল, চিরতরে সরে গেল জীবন থেকে। একটু কলঙ্ক তার রটবে—কিন্তু তীব্র অস্বীকারের জোরে সে তা উড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু আবার যদি এমন কিছু ঘটে, দুর্নাম তার জোর পাবে।

বড় একটা মামলা ছিল সুবলের এ-সময়, মনটা একেবারে খিঁচড়ে গেল! নাঃ, মনটা একটু শক্ত করতে হবে তার। সবে প্র্যাকটিস জমছে।

বাকী দিনটুকুতে ছোট মহকুমা সহরের চারিদিকে যে তাদের নামে ঢি-ঢি পড়ে গেছে, সেটা সুখময়ী টের পেল সন্ধ্যার পর নটবরের হাতে বাখারি খেয়ে। বাকী দিনটা বাড়ির সকলে মুখ ভার করে থেকেছে, তাকে বাদ দিয়ে করেছে জটলা। বিকেলে আড্ডা দিতে বেরিয়ে সন্ধ্যার পর মুখ অন্ধকার করে নটবর ফিরে এল, গর্জাতে গর্জাতে মা আর ভাইকে জানিয়ে দিল সহরশুদ্ধ লোক কী বলাবলি করছে এবং খবরটা ভালো করে শুনবার আগ্রহে সুখময়ী কাছে এসে দাঁড়াতে সরু একটা বাখারি তুলে তার পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। সরু বাখারির বেতের মতো ধার, পিঠ কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল সুখময়ীর।

কিন্তু সে তীব্র ব্যথা তার কাছে অতিরিক্ত ঝাল-খাওয়া সুখের মতো

লাগল। কলংক তবে রটেছে! তবে আর এখন কী বাধা রইল সুবলের তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার? এ বদনাম সয়ে সে তো আর টিঁকতে পারবে না এখানে। যেতে হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না কেন?

নটবরের মা বলল, 'থাক, থাক। মারধোর করে কাজ নেই। ও-বৌকে তো আর ঘরে রাখা যাবে না। কাল সকালে খেদিয়ে দিস। মামার বাড়ি যাক, নয়তো চুলোয় যাক।'

শুনে একটু ভাবনা হল সুখময়ীর। সত্যি তাকে তাড়িয়ে দেবে নাকি? গালাগালির জন্য সে তৈরী হয়েই ছিল, তার উপর নয় কিছু মারধোর হয়েছে। কিন্তু খেদিয়ে দিলে তো মুস্কিল! সুবলের যদি বেশি রকম রাগ হয়ে থাকে, তাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে না চায়! পুরুষের মন তো, বিগড়ে যেতে কতক্ষণ! তবে তো তার একুল-ওকুল দুকুল যাবে, মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে না জগতে। মামা কি ঠাঁই দেবে তাকে? মামারও তো শুনতে বাকী থাকবে না এ কেলেংকারির কথা।

ভাবে আর সুবলের প্রেমে বিশ্বাস হারিয়ে সে পিঠের জ্বালায় কাতরায়। চুলোর ধোঁয়ায় তার চোখ জলে আর ভাতের হাঁড়ির বাষ্পে জগৎ ঝাপসা হয়ে যায়। আগুনের আঁচে মাঝেমাঝে শরীরটা শিউরে ওঠে, জ্বর আসবার মতো উদ্ভট শিহরন। জল ছুঁতে গিয়ে গা ছমছম করে। জ্বর কি একটু এসেছে তাহলে তার? সকলকে ভাত দিয়ে হেঁসেল তুলে খাওয়ার অনিচ্ছা নিয়ে খিদের জ্বালায় কিছু খায়। রসুইঘর বন্ধ করে কুপি হাতে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ায় কুপিটা নিভিয়ে রেখে ঘরে ঢোকে। চৌকিতে বসে নটবর তামাক টানছে। কাল তাকে খেদিয়ে দেবে নটবর। এতকাল সোহাগ করে কাল তাকে দূর করে দেবে। সুবলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েই বা তার তবে কী লাভ হবে? বৌকে যদি মানুষ খেদিয়ে দিতে পারে, দুদিন পরে সুবল কেন তাকে ফেলে পালাবে না?

নটবরকে একটু নরম করার চেষ্টার কথা মনে আসে, কিন্তু সুখময়ী উৎসাহ পায় না। রাগ কমিয়ে কতবার সে নটবরের সোহাগ আদায় করেছে, কৌশল তার অজানা নয়, কোনদিন ব্যর্থও হয়নি। আজ সে মনে জোর পায় না। বাখারির মার খেয়েছে বলে নয়। মার খেলেও মান বাঁচিয়ে সোহাগ যাচা যায়। নিজের উপরেই আজ তার বিশ্বাস নেই। নিজেকে কেমন রূপহীনা, কুৎসিত মনে হচ্ছে। তার যেন কাঠির মতো সরু আর কাঠের মতো শক্ত দেহ। কী দিয়ে সে নটবরকে নরম করবে? তার চেয়ে শুয়ে পড়া ভালো। মাথা ঘুরছে, পিঠ জ্বলছে, শরীর ভেঙে পড়ছে, চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে রাতটা কাটানো যাক। সুবল নটবর সকলের ভরসাই যখন তার ফুরিয়ে গেছে, কী আর হবে আকাশ পাতাল ভেবে।

চৌকিতে উঠতে তার ভরসা হলনা। মেঝেতে মাদুর বিছাতে গেল। তখন কথা কইল নটবর।

'দোর দে, হুঁকোটা রাখ।'

সুখময়ী দুয়ার বন্ধ করে হুঁকোটা রেখে মাদুরে শুয়ে পড়ল। পিঠে ব্যাথা ছিল, মনে খেয়াল ছিল না, অভ্যাস মতো চিৎ হয়ে শুয়েই মৃদু আর্তনাদ করে সে পাশ ফিরল। চৌকিতে বসে প্রদীপের আলোতে নটবর তাকে খানিক দেখল, পা গুটিয়ে কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে বৌটা তার শুয়েছে!

'পিঠে ব্যাথা হয়েছে নাকি বৌ? গোসা হয়েছে? আর মারবো না তোকে। কোন শালা আর তোর গায়ে হাত তোলে!'

'আমায় কাল তাড়িয়ে দেবে?'

'দূর পাগলি। ও কথার-কথা বলছিলাম। তোকে ছেড়ে কি থাকতে পারি?'

সুখময়ী নিজেই স্বামীকে বুকে টেনে নিয়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুজল। মাদুরের ঘষায় পিঠে যেন তার করাত চলতে লাগল অনেকগুলি।

একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আবার চেতনা ফিরে এল, তবু সে শব্দ করল না। আর্তনাদগুলি বুকে চেপে,গোঙানিগুলি গলায় আটকে রেখে দিল। নটবর ছেড়ে দেওয়ামাত্র সে পাশ ফিরল। আলো নিভিয়ে চৌকির বিছানায় শোবার সময় কর্তব্যবোধে নটবর বলল, 'গা যেন তোর গরম দেখলাম, জ্বর হয়েছে নাকি ?'

'একটু হয়েছে।'

'মেঝেতে কেন তবে ? চৌকিতে উঠে আয়।'

'যাই।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৌকিতে সে গেল না। আলো নেবার আগে সে দেখেছে, পিঠের রক্তে মাদুর লাল হয়ে গেছে।

নটবর ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঘুম গাঢ় হয়ে এলে তার নাক ডাকতে আরম্ভ করল। তখন চুপিচুপি দরজা খুলে সুখময়ী বাইরে বেড়িয়ে গেল। রাত বেশি হয়নি, শশধর জেগে আছে। পাড়ার লোকও হয়তো জেগে আছে অনেকে। থাক জেগে ! কতক্ষণ লাগবে তার সুবলকে দুটি কথা শুধিয়ে আসতে ? বাগান হয়ে বেগুনক্ষেত পার হলেই সুবলের বাড়ি।

ডুবুডুবু চাঁদের জ্যোৎস্না এখনও একটু আছে। বাগানের গাঢ় অন্ধকার কোন রকমে পার হলে পথের চিহ্ন নজরে পড়ে। সুখময়ী তরতর করে বেগুনক্ষেতের বেড়া ঘেষে এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফেরা চাই, নটবরের ঘুম ভেঙ্গে গেলে যাতে সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎটা দেওয়া যায়। সুবলের বাড়ির ঘরে ঘরে আলো নিভেছে। তার ঘরের পাশে গাঁদাফুলের বাগান। একটু তার ফুলের বাগান করার সখ আছে। বাড়ির সামনের বাগানটি তার দেখবার মতো,

এখান থেকে নানা ফুলের মেশান গন্ধ নাকে আসে। প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়ে সুবল বেরিয়ে এল।

'চুপ। আস্তে। আবার কেন?'

'ছাখো, তোমার জন্মে কি মারটা মেরেছে আমায়।'

'তোমার জন্মে আমার বদনাম হল সুখময়ী। কত ভালো বলতো লোকে আমায়, কত সম্মান করতো, তোমার জন্মে সব গেল।'

'চল আমরা পালিয়ে যাই দুচার দিনের মধ্যে। সব বেচে দাও—'

'তোমার খালি বাজে কথা। সব বেচে মোক্তারি ফেলে কোথায় যাব?'

'এত কেলেংকারী হল, চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে গেল, তবু থাকবে? কি করে থাকবে?'

'আস্তে আস্তে ভুলে যাবে লোকে।'

সুখময়ী আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসছিল, সুবল তার হাত চেপে ধরল।

'শীগগির ফিরতে হবে।'

'একটু বসে যাও? বৌ মরে গেছে কবে, এতকাল বিয়ে করিনি তোমার জন্মে? একটু বসে যাও?'

সুবলের ঘাট বাঁধানো। মোক্তারির টাকায় সবে ঘাট বাঁধিয়েছে, এখনো কোথাও ফাটল পর্যন্ত ধরেনি। ঘাটের ধোয়া মোছা পরিষ্কার সিমেন্টও সুখময়ীর পিঠের রক্তে লাল হয়ে গেল। সমস্ত ঘাট নয়, সুখময়ীর পিঠের নিচেকার অংশটুকু।

পরদিন নাইতে এসে লোকে বলল, কুকুর বা বিড়াল ছানা বিইয়েছে সেখানে। কিম্বা বুনো শেয়াল।



মেঝেতে বিছানো মাদুরে আছড়ে পড়ে রাঘব তখন সতর্ক চাপা গলায় আর্তনাদ করার সঙ্গে বার তিনেক জোরে জোরে নিজের কপালটা চাপড়ে দেয়। গায়ে জোর আছে, কড়া-পড়া হাতের তালু। গলার চেয়ে কপাল চাপড়ানোর আওয়াজটা হয় জোরালো।

'অসতী করেছে করেছে, প্রাণে মারতে পারল না? ধম্মো নিল, প্রাণটুকু নিতে তার কী হয়েছিল!'

ফাঁসি হবে বলে নিজে সুমতিকে খুন করতে পারছে না, এ আপসোস সে জন্য নয়। আপসোস এখনো সুমতিকে নিয়ে ঘর করতে হবে বলে। তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই, বিবাগী হয়ে ছেড়ে যাবার ক্ষমতা নেই। লোহার মতো শক্ত তার দেহমন এই জীবন্ত কোমল চুম্বকে এঁটে গেছে। পিস্তলের সঙ্কেতে ছোটবাবু মৃত্যুভয় জাগিয়েছিল সুমতির,

বাইরের রোয়াক থেকে এক-পা এক-পা করে পিছু হটিয়ে এই ঘরে ঢুকিয়েছিল। যাওয়ার আগে একটি গুলি সুমতির উপর খরচ করে গেলেই এসব হাঙ্গামা চুকে যেত।

সুমতি বলে, 'কি জ্বালা, বেশ্যা নিয়েও তো কত মানুষ সুখে দিন কাটাচ্ছে। তোমার বুক জোড়া ধন বিয়ে না করা ইস্তিরিটি কী ছিল আগে? যা হয়েছে, হয়ে গেছে। অত বাড়াও কেন?'

চৌকিতে তালির পর তালি দেওয়া সাবান-কাচা ময়লা মশারি। বেশি কাচবার উপায় নেই, জীর্ণ মশারি ছিঁড়ে যায়। কোমর পর্যন্ত শরীর বার করে চৌকির প্রান্তে কনুই পেতে দুহাতের তালুতে চিবুক রেখে সুমতি নির্বিকার শান্তভাবে বলে, 'আর তাও বলি, বদমাস গুণ্ডা তো নয়, লাখপতি বামুনের ছেলে। সেকালে মুনিঋষি অতিথ হলে রাজারা যেচে রানীকে পাঠিয়ে দিত তাদের কাছে, ভাগ্যি বলে মানত। একটা রাজার বংশ থাকত নইলে?'

রাঘব উঠে বসে অসহায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। একটু যদি কাঁদাকাটা করত সুমতি, একবার যদি বলত, এ-প্রাণ আমি আর রাখব না! গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত।

'বিছানায় এস। মিথ্যে কেন সারারাত মশার কামড় খাবে?'

'এ-জীবনে আমি আর তোকে ছোঁব ভেবেছিস?'

'ছুঁয়ো না। মাঝখানে পাশ বালিশটা দেবখন।'

দরজা বন্ধ করলে মাটির ঘরখানার ছোট জানলা দিয়ে ভালো বাতাস আসে না। পচা ইঁদুরের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি। অনেক খুঁজেও ইঁদুরটা আবিষ্কার করা যায়নি। মশারির ভিতরে পচা গন্ধটা অল্প সুবাসের তলে চাপা পড়ে গেছে। তার খানিকটা রাঘবের কিনে দেওয়া সুগন্ধি কেশ তৈলের, খানিকটা ছোটবাবুর আতর মাখা রুমালের। রুমালটা ছোটবাবু ফেলে গেছে।

পিস্তলের কথাটা রাঘবের কেমন একটু গোলমেলে মনে হয়। যার টাকা আছে, সহায় আছে, সুন্দর চেহারা আছে—সে কেন এভাবে খেয়াল মেটাবে সোজাসুজি ভুলানোর চেষ্টা না করে? সব চেয়ে বড় কথা, সুমতির জন্ত পাগল হবার কী কারণ আছে ছোটবাবুর? প্রদীপের মতো সুমতিকে ম্লান করে দিতে পারে বিদ্যুতের আলোর মতো এমন নারী-দেহের অভাবে তার স্বভাব নষ্ট হবার কথা তো নয়।

জিজ্ঞাসা করলে সুমতি প্যাঁচালো জবাব দেয়। 'আমি কি দেখেছি পিস্তল না বন্দুক? ভয়ে বলে আমার তখন বুক ঢিপ-ঢিপ করছে। কি যেন একটা বার করলে পকেট থেকে—'

তিন দিন অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে। মাটিবহুল সহর যেন ধুয়ে যাবে মনে হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে বাঁধা সড়কের দুটি যোগাযোগ জখম হয়ে গেছে। প্রথম দুদিন নির্মলেন্দু ওয়াটারপ্রুফে গা ঢেকে তার স্পিনিং মিল এবং নারকেলের ছোবড়া ও তেলের কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়েছিল। বর্ষার অজুহাতে অনুপস্থিতি বেড়েছে, কাজে আরও ঢিল পড়েছে, আরও বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়েছে। রাগে আগুন হয়ে নির্মলেন্দু ফিরে এসেছে। অবেলায় ব্রাণ্ডি আর হুইস্কি মিশিয়ে গিলেছে, ধীরেনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, সিগারেট চাইতে চুরুট এনে দেওয়ায় নন্দের গালে মেরেছে চড়। তার ছটফটানির মতো বাইরে ক্রুদ্ধ বাতাসে আছাড়ি-পিছাড়ি করেছে বড় বড় গাছ আর ভাঙা ভাঙা যুদ্ধের গর্জনের মতো আকাশে গুরু গুরু ডেকেছে মেঘ।

খদ্দরের ভিজে জামা কাপড় কয়েক ঘণ্টা ধরে ধীরেনের স্বাভাবিক শান্ত মেজাজ আরও যেন শান্ত করে দিয়েছে। দুটি পাঞ্জাবিই ভিজে যাওয়ায়

নির্মলেন্দুর একটি গেঞ্জি ধার নিয়ে গায়ে চাপিয়ে সে বলেছে, 'এত অল্পে ক্ষেপে গেলে বড় কাজ হয় না।'

'অল্প! হিসেব মতো একটা কাজ হচ্ছেনা, সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে, যত সুবিধে দেওয়া হচ্ছে শূয়ারকা বাচ্চাগুলোর ততই বজ্জাতি বাড়ছে, এ হল তোমার অল্প! তুমি, দিবাকর, দীনেশবাবু সবাই তোমরা অপদার্থ, শুধু স্বপ্ন দেখতে জানো।'

মুষড়ানো মন নিয়ে নির্মলেন্দু গুম খেয়ে থাকে। কেউ যেন ভালো চায় না, উন্নতি চায় না। জেলায় বার-তের হাজার তাঁতি পরিবার তাঁত বোনে। হাটে বাজারে সুতো কেনে আর দিনের পর দিন এক ধাঁচের সস্তা কাপড় বুনে যায়—শতকরা সত্তর ভাগ তার শাড়ি। দূরে কোনো অজুহাত সৃষ্টি হয়, কারও একটু খেয়াল জাগে, হাটে বাজারে সুতোর দাম চড়ে যায়। সাড়ে সাতশো তাঁতি নির্মলেন্দুর প্রজা। অন্তত এই জেলার তাঁতিদের সরবরাহের জন্য স্পিনিং মিল করা আর তার নিজের প্রজা তাঁতিদের নতুন নতুন ডিজাইন শেখান খুব সহজ মনে হয়েছিল। সমুদ্রের লোণা স্নেহে এ-অঞ্চলায় শ্যামল সতেজ নারকেল গাছের ছড়া-ছড়ি—নিউ ইণ্ডাস্ট্রির অজস্র মেটিরিয়াল। ভূমিহীন কর্মহীন মানুষের বাঁচবার নতুন উপায়।

ব্যবসায়ী-জমিদার বাপের সঞ্চয়-ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মতো নির্মলেন্দু ঘুরে ঘুরে লোকের অবস্থা দেখে বেড়িয়েছে আর জনসংখ্যা, চাষের জমি, গৃহশিল্প, আমদানি রপ্তানী, লাভ লোকসান এই সব হিসাব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। একটানা দিন পনেরোর বেশী নয়। কারণ, এরা যে ধ্বংস হয়ে গেল, এরা যে ধ্বংস হয়ে গেল, এই মন্ত্রের আবৃত্তি মনের মধ্যে প্রতিদিন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠতে উঠতে এক পক্ষের মধ্যেই সাইরেনের আওয়াজের মতো অসহ্য হয়ে উঠেছে। তখন কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে রাতের পর রাত শুনতে হয়েছে সঙ্গী-সাথীর কর্কশ

কোলাহলকে ছুরি দিয়ে কাটার মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠের গান, চুমুকের পর চুমুক দিতে হয়েছে গেলাসে আর অনেক রকম পাশবিক প্রক্রিয়া দিয়ে করতে হয়েছে শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতার সঙ্গে প্যাঁচে প্যাঁচে জড়ানো বর্বরতাকে মুক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস।

তারপর শ্রান্ত হয়ে একদিন দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে পোষাক বদলে রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়ে একবার, শুধু একবার, বাহুর বাঁধনে ধরা দেবার জন্য মাধবীকে মিনতি করা এবং এই মাটির সহরে ফিরে এসে তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামান, যাদের প্রত্যেকের মুখে সে ঘোষণা-চিত্র দেখতে পায়: আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। তোমার টাকা আছে, সহায় আছে, বয়স আছে, আমাদের বাঁচাও।

নির্মলেন্দুর মনে হয়, সত্যই এ দায়িত্ব তার। যাদের ইচ্ছা ছাড়া কিছু নেই, ধীরেনের মতো যাদের দুটি খদ্দরের জামা সম্বল, তারা চেষ্টা করেও কী করতে পারে? এ-কাজ তার, ওদের নয়।

তবু ওরা প্রাণ দিতে চায়, হয়তো দিতেও পারে, তাই কাজ আরম্ভ হয়েছে ওদের রীতিতেই। কিন্তু এগোচ্ছে কই কাজ? আত্মরক্ষার সাধ কই জাগছে তাদের মধ্যে যাদের তারা বাঁচাতে চায়? অগ্রিম পুরস্কার হাত পেতে নিচ্ছে, তিরস্কার শুনে অপরাধীর মতো হাসছে। শাস্তি নেই, তাই যে যত পারে দিচ্ছে ফাঁকি। তবু এখনও ধীরেন, দিবাকর আর দীনেশ চাবুকের বিরোধী, শুধু কথা বলে বুঝিয়ে ওরা সকলের চেতনা জাগাতে চায়।

রাঘবকে একদিন খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পিঠের খানিকটা চামড়া চেঁছে নিয়ে সেখানে লঙ্কা বাটা লাগিয়ে দিলে, তার তিনটে দাঁত ভেঙে ফেললে আর ভেড়ির বাঁধ কেটে তার জমিতে লোণা জল ঢুকিয়ে দিলে, আরও সাঁইত্রিশ জন কি সুতো নিয়ে কাপড় বোনার বদলে বেচে ফেলতে সাহস পেত? মাইনে কাটা গেলে কি রোজ মজুরদের অসুখ করত?

লাঠির গুঁতো খাবার ভয় থাকলে কি সাবান, ফিনাইল, ওষুধের পয়সায় তাড়ি গিলত ? ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে জানলে কি কেউ দুদিনের জন্য কাজে ঢুকে কোম্পানীর পয়সায় ভাঙা ঘরের সংস্কার করিয়ে সরে পড়ত ?

তৃতীয় দিন নির্মলেন্দু গিয়েছিল রাজগঞ্জে—মাইল তিনেক মোটরে, এক মাইল পায়ে হেঁটে, বাকী পথ নৌকোয়। রাজগঞ্জে রাঘব বাস করে। রাত্রে সে যখন ফিরে এল, মেজাজে তার এতটুকু উত্তাপ নেই। পরদিন মেঘহীন আকাশে তেজী সূর্য দেখা দিল, সে-ও চলে গেল কলকাতায়।

ডাক্তার বলল, 'ভয়ের কিছু আছে মনে হয় না। গেরস্ত ঘরের বৌ তো ?'

নির্মলেন্দু বলল, 'ছোটলোকের বৌ, ভীষণ নোংরা। দুর্গন্ধে ঘরে দম আটকে আসছিল।'

'কী যে খেয়াল আপনার !'—ডাক্তার হাসল, 'দেখা যাক। কদিন থেকে যেতে হবে।'

'থাকব।'

রাজগঞ্জে সুমতি তখন বালিশের তলা থেকে নির্মলেন্দুর দামী রুমালটি বার করে নাকের সামনে নাড়ছিল। সুগন্ধ অনেকটা উপে গেছে। মনের গর্ব তার একবিন্দু কমেনি। এ-জগতে তার তুলনা নেই। রাজাকে জয় করেছে, কে বলে সে রাজকন্যা নয় ?

কলকাতার বাড়িতে মা-বোনেরা থাকে, আর থাকে আত্মীয়-স্বজন। তারা স্নেহযত্ন আত্মীয়তা তোষামোদ দেয় অজস্র। নির্মলেন্দু কৃতজ্ঞচিত্তে সব গ্রহণ করে, আশ্রিত ও শিশুদের মন জোগানোর সস্তা চেষ্টা পর্যন্ত। মানুষের মনের মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাকে মুগ্ধ করে দেয়। সে

জুড়িয়ে যায়। সিনিকের অবস্থা সে পার হয়ে গেছে অনেক দিন, দাম কষতে আর সে ভুল করে না। চার বছরের বেকার জীবন ধীরেনকে হিসেব ভুলিয়ে দিয়েছে, বাড়ি থেকে চিঠি এলে যে-ভুলের জন্য আজ তার মুখের তীব্র জ্বালা-ভরা হাসি ফুটে ওঠে। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে কিনতে হয় বলে এসব চিঠির যেন দাম নেই। টাকা দিয়ে আরাম যদি মানুষ কিনতে পারে, স্নেহ কিনতে এত বিতৃষ্ণা জাগে কেন?

নির্মলেন্দু বলে, 'যা আছে আছে, যা নেই নেই। না জেনে যা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যেতে, স্বরূপটা জানামাত্র বিগড়ে যাবে কেন? তোমরা, সিনিকেরা, গণ্ডমূর্খ।'

মাধবী সম্পর্কে তার নিজের উদাহরণটা অনেকবার উল্লেখ করতে গিয়ে চুপ করে গেছে। তার টাকায় স্থায়ী অধিকারের লোভে মাধবী ধরা দেয় না, তপস্যা করার মতো তাকে ভুলানোর, আরও ভুলানোর, অভিনয় করে। দুদিনের জন্য শুধু তার বিরক্তি এসেছিল, আজ লোভী মাধবীর ছলাকলা আগের মতোই তার চোখে দুপুর বেলার রোদকে জ্যোৎস্না করে দেয়, রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই রীতি মাধবীর ভালোবাসার। অন্য রীতিতে মাধবী ভালোবাসুক, এ-কথা ভাবাও কি বোকামি নয়?

মাসীমা বলে, 'বড় রোগা হয়ে গেছিস বাবা, আমার মাথা খাস একটু তাকা শরীরের দিকে।' পিসীমা বলে, 'কালীঘাটে তোর নামে একটা মানত করেছি, কাল একবারটি নিয়ে চ আমায়, পূজো দিয়ে মন্দিরে দাঁড়িয়েই প্রসাদী ফুল কপালে ছোঁয়াব।' আরও অনেকে অনেক কথা বলে। মাসীর ছেলে নন্তু ডাক্তারী পড়বে। পিসীর মেয়ে নলিনীর বিয়ে সামনের মাসে। আরও অনেকে অনেক উদ্দেশ্য রাখে। নির্মলেন্দু হাসিমুখে বলে, 'নন্তুকে আমার মিলে ঢুকিয়ে দেব মাসী। নলিনীর বিয়ে দেব ধীরেনের সঙ্গে।'

মাসী ও পিসী শুকনো মুখে হাসির জবাবে কোনো রকমে হাসে। মুখের

হাসি নিভে অনেকের মুখ শুকনো হয়ে যায়। সবাই ভাবে, এখন এক খেয়ালে আছে, খেয়াল বদলাক, হৃদয় মন উজাড় করে স্নেহ ঢেলে মন ভিজিয়ে সময় মতো আবদার ধরে প্রার্থনা মেটাতে হবে।

পিসীমার প্রকাণ্ড অনুরোধটি কেবল সে রক্ষা করে, নিজে তাকে কালীঘাটে নিয়ে যায়। পিসীমার ভণিতাটিই সকলের চেয়ে আর্টিস্টিক। মন্দিরের প্রাঙ্গণে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তার সামনে জলে ভেজা কুচকুচে কালো শিশু জীবকে হাড়িকাঠে ফেলে সামনের পা ঘেঁষে কোপ দিয়ে বলি দেওয়া হয়, অদূরে গেটের ধারে মাংস বিক্রী করে, মাংসের কাছে নেতিয়ে পড়ে থাকে কালো চামড়াটি, পালিশ করা কালো জুতোর মতো চকচকে। বাইরে রাস্তার ধারে আটচালায় একপাল পাঁঠা নজরে পড়েছিল মনে পড়ে যায়।

পশুর চামড়া মানুষের কাজে লাগে। ট্যান করা চামড়া।

এক মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় ভাব কেটে গিয়ে নির্মলেন্দু মাটির সহরে ফিরে যাবার জোরালো তাগিদ অনুভব করে। তার জেলায় পশুর অভাব নেই। ট্যানিং-এর একটা কারখানা তো করা চলে অনায়াসে, রাজগঞ্জের উত্তরে ঝিলের ধারে যে প্রকাণ্ড জমি খালি পড়ে আছে, সেইখানে?

পরামর্শ-দানেচ্ছুরা বলে, 'আজকেই ফিরে যাবে কেন? এক্সপার্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে একটা প্ল্যান ঠিক করে নাও? ট্যানিং-এর প্রসেস্ জানা লোকও দেখে শুনে ঠিক করতে হবে তো?'

নির্মলেন্দু জবাব দেয়, 'সবাইকে পাওয়া যাবে। একটা বিজ্ঞাপন দিলে দলে দলে ছুটবে সেখানে।' মাধবী বলে, 'দুতিন সপ্তাহ থাকবেন বলেছিলেন যে? কদ্দিন পরে দেখা হল, থেকে যান না কটা দিন?'

আনাখামারের বাড়িতে নির্মলেন্দুর ঘরের কাছেই একটি একক নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে থাকে। জানালা দিয়ে দেখা যায়। ঝড়ের সময় একদিকে পাতা বাড়িয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখতে ভালো-লাগা কেমন

অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল! রবীন্দ্রনাথের অনুশাসনে মধ্যযুগের সংস্কৃতিকে শৈশব স্মৃতি দিয়ে অনুভব করার মতো গৌরব বোধ হত। গাড়ির গতিবেগের হাওয়া মাধবীর কাঁধের আঁচল আর মাথার আলগা কতগুলি চুল পিছনে ঠেলে দিয়েছে, তার নেতিয়ে-পড়ে হেলান দিয়ে বসার ভঙ্গিটা সামনের এক অদৃশ্য মানুষের দেহের চাপে পিছন দিকে বাঁকা হয়ে যাওয়ার মতো।

'হোটেলে একটা ঘর নিয়ে রেখেছি।'

'সত্যি, আপনি কত বড়লোকের ছেলে, কিভাবে আপনি মানুষ হয়েছেন, এসব মহৎ কাজে আপনি এমন ভাবে উঠে পড়ে লাগবেন, কখনো ভাবতেও পারিনি।'

'সেই ঘরে ফিরে যাই চলো। আজ রাত্রের ট্রেনে আর যাওয়া হবে না।'

'এমন অবাক হয়ে গেছে সকলে! সব বড়লোকের ছেলেরা আপনার মতো হলে দেশের ইকোনমিক প্রবলেম কত সহজে সলভড্ হয়ে যেত!'

গাড়ির গতি কমে আসে, হঠাৎ দমক মেরে রাস্তার বাঁ দিকে দুটি বড় বড় গাছের গুঁড়ির ব্যবধানের মধ্যে ছোট-বড় আগাছার ঝোপ ঠেলে গাড়ি কয়েক হাত গিয়ে থেমে যায়।

'এই গাড়িই তবে আমাদের বাসর ঘর হোক।'

নির্মলেন্দু গাড়ির আলো নিভিয়ে দেয়। ভিতরের বাইরের সমস্ত আলো। মাধবী দরজা খুলে টুক করে নেমে যায়। দাঁড়ায় গিয়ে পথে। এখানে পথের ধারে অনেক দূরে-দূরেও আলো নেই। দূরে মানুষের বসতি আছে এটুকু শুধু বোঝা যায় দু-একটি আলো দেখে। রাস্তা দিয়ে একটি টিমটিমে আলো দুলতে দুলতে মৃদু গতিতে এগিয়ে আসছে আর পাওয়া যাচ্ছে গরুর গলায় বাঁধা ঘন্টার টুংটাং আওয়াজ। নির্মলেন্দু পাশে এসে দাঁড়ায়। মধ্য রাত্রির স্তব্ধতায় পাশের ঘরে

ঘুমন্ত দাদার ক্রিমির দোষে দাঁতে দাঁত ঘসার শব্দ মাধবী প্রায়ই শুনতে প্রায়। নির্মলেন্দুও মুখে তেমনি রোমাঞ্চকর শব্দ করছে।

'নিজে থেকে ফিরে চলো, লক্ষ্মী মেয়ে! নইলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব। জান তো আমায়?'

'কী বলছিলাম? হ্যাঁ—আপনাকে আজকাল দেবতার মতো ভক্তি করি। সাড়ে দশটার গাড়িতে চলে যাবেন, আর হয়তো সুযোগ পাব না, প্রণামটা এখুনি করে রাখি।'

সেইখানে হাঁটু পেতে বসে মাধবী প্রণাম করে। ব্যাপক প্রণাম। স্যাণ্ডেল পরা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে রাখে কয়েক সেকেণ্ড, সোজা হয়ে ধীরে ধীরে পায়ে আঙুল বুলিয়ে মাথায় ঠেকায়। নির্মলেন্দু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ সমস্তই অভিনয়। কিন্তু কার ক্ষমতা আছে এ অভিনয়কে অগ্রাহ্য করার?

গরুর গাড়ি ধীরে ধীরে আরও কাছে এগিয়ে আসে। মাধবী উঠে দাঁড়ালে নির্মলেন্দু বলে, 'একটু পাশের দিকে সরে দাঁড়াও, গাড়িটা ব্যাক করি।'

সঙ্গী-সাথীরা বাড়িতে জমা হয়ে অপেক্ষা করছিল, সে ফেরামাত্র সকলে কোলাহল করে উঠল।—'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আজকেই নাকি ফিরে যাবে? আজ যেও না। একটা রাত, শুধু আজকের রাতটা, একটু আনন্দ করি এসো।'

নির্মলেন্দু বলল, 'আনন্দ করব, গাড়িতে।'

এক-একজন এক-একটি কাজের ভার নিয়ে চলে যায়। স্ত্রীলোক সংগ্রহ করতে কেউ, কেউ পানীয়, কেউ খাদ্য। গাড়ি ছাড়ার আধ ঘণ্টা আগে কামরা জুড়ে বসে শুধু উত্তেজনায় তাদের নেশা হয়েছে মনে হয়, স্ত্রীলোক তিনটি থেকে থেকে অকারণে খিলখিল করে হেসে ওঠে। নতুনত্ব এই, এই তো অ্যাডভেঞ্চার! ছোটবাবু ছাড়া কার মাথায় এ বুদ্ধি আসত?

এদিকে আত্মীয়তা দাবী করে নির্মলেন্দুকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার অধিকার। গাড়ি ষ্টেশনে যাবে, গাড়ি ফিরে আসবে, কাউকে সঙ্গে নিতে নির্মলেন্দুর আপত্তি কেন? আপনজন কি তার কেউ নেই যে বাড়ি থেকেই সে যাত্রা করবে একা? সে সিনিক নয়, মমতা আর খাতির দুই-ই তাকে সমান মুগ্ধ করে, কিন্তু এ নেকামি কি সহ্য হয় মানুষের? প্রচণ্ড ধমকে গুরুজনেরা স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিক, নির্মলেন্দুর বাপও এমনি ছিল। ভাব করতে গেলে এমনিভাবে সে খেঁকিয়ে উঠত। একজন শুধু মিইয়ে মিইয়ে কাঁদে, পাঁচ বছরের ছোট বোন। মা নিষেধ করেন, 'যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলিস নে খুকী।' খুকীর কাছে নির্মলেন্দু বিদায় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। কোলে তুলে নিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে খুকী বলে, 'আমার পিয়ানো কই—ছোট পিয়ানো?'

ধীরেন বলল, 'চারদিকে গোলমাল চলছে, তুমি কি বলে হঠাৎ কলকাতা চলে গেলে? একটা চেক পর্যন্ত সই করে রেখে যাওনি।'
নির্মলেন্দু বলল, 'আর গোলমাল হবে না। এবার আমি সব ভার নিলাম। আমি একা মিল চালাব।'
'আমরা কী করব?'
'কাজ করবে, মাইনে পাবে। দেড়শো টাকা এলাউন্স পাচ্ছ, মাইনে পাবে একশো। যদি পোষাবে না মনে কর, তোমায় আমি জোর করে আটকাব না ভাই।'
'তার মানে তোমার চাকর হয়ে থাকতে হবে?'
নির্মলেন্দু লোহাটে হাসি হেসে বলল, 'চাকর কেন, কর্মচারী। তাও শুধু অফিস টাইমে। অন্য সময়ে যেমন বন্ধু আছ তেমনি থাকবে।

তাছাড়া, সামনের মাসে নলিনীকে বিয়ে করে আত্মীয় হয়ে যাবে। বিয়ের পর মাইনে বাড়িয়ে দেড়শো করে দেব।'

হুকুমের পর হুকুম জারি হতে থাকে, কেউ বরখাস্ত হয়, কেউ গালাগালি খেয়ে আরেকবার সুযোগ পায়, কর্মচারীর বেতন আর মজুরের মজুরী চলতি হারে নেমে যায়, অত্যাচারের যে ক্ষমতা অফিসারদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেটা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, বাড়তি সুবিধা বাতিল হয়ে যায়, চুপিচুপি নির্মলেন্দুকে খবর জানাবার স্পাই গজিয়ে ওঠে কয়েকজন। মিলের কাঠের গেটের স্থানে লোহার গেট বসে, গেট বন্ধ করবার আর খুলবার সময় লোহার শিকল ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

গোড়ার দিকে একবার শুধু কয়েকটি গোঁয়ার হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করে; গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সামনা-সামনি নির্মলেন্দুর সঙ্গে কথা বলবার দাবী জানিয়ে তারা হল্লা সুরু করে এবং পুলিশ এসে কয়েকজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যায়।

রাঘবের যে অপরাধ আগেই ক্ষমা করা হয়েছিল, এতদিন পরে সেই অপরাধে ছমাসের জন্য তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর একদিন নির্মলেন্দু রাজগঞ্জের উত্তরে ঝিলের ধারে তার নতুন কারখানা দেখতে যায়। দ্রুত গতিতে ট্যানিং-এর কারখানার অনেকগুলি ঘর উঠেছে, কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এখনো কয়েকটি ঘর তোলা হচ্ছে। বর্ষার পরে এখন শরৎকাল। শ্বেত পদ্মের পাতা আর ফুলে ঝিলের জল চোখে পড়ে না। কেবল কারখানার দিকে তীরের কাছে ফুল আর পাতা সাফ করে ফেলা হয়েছে।

আগে এই ঝিলের ধারে দাঁড়ালে পদ্মের ঘন গন্ধে মোহ জাগত। আজ এলোমেলো বাতাস শুধু দুর্গন্ধ এনে দেয়। ঘরের কোথাও ইঁদুর পচলে এরকম গন্ধ হয়।

সুগন্ধি সিল্কের রুমাল নাকে চেপে ধরে নির্মলেন্দু গ্রামের দিকে চলতে থাকে। গ্রাম পর্যন্ত চামড়ার কারখানার গন্ধ পৌঁছয় না, তবু রাজগঞ্জের সমস্ত মানুষ ঝিলের ধারে কারখানা বসানোর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছে। আন্দোলন সে গ্রাহ্য করে না। সে জানে, ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে দুদিন পরে এ আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গাঁয়ের পথে তাকে একলা দেখে কোনো গোঁয়ার প্রজা লাঠি মেরে বসবে না তো?

মাটির ঘরের রোয়াকে সুমতি চাটাই পেতে শুয়ে ছিল। জুতোর শব্দে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ঘরে আজ পচা ইঁদুরের গন্ধ ছিল না। শুধু সুমতির চুলে একটা সস্তা কেশ তৈলের গন্ধ আছে। রাঘব তাকে যে তেলের শিশিটা কিনে দিয়েছিল এখনো সেটা ফুরিয়ে যায়নি। নির্মলেন্দুর কারখানার নারকেল তেল গাঁয়ের মুদিখানায় বিক্রী হয়। সেই নারকেল তেলের সঙ্গে একটু একটু সুগন্ধি তেল মিশিয়ে সুমতি ব্যবহার করে।



শশধর ঘোষের বড় মেয়ে শ্রীমতী বেলারানীর প্রথম ছেলের মুখে ভাত দেওয়া হবে। ভোজ রান্নার জন্য গগন ঠাকুরকে ডেকে পাঠান হল। একবার, দুবার, তিনবার। আসব ব'লেও গগন আর আসে না। শশধর উদ্বিগ্ন হলেন। বেলারানীর ক্রোধের সীমা রইল না।

"ওর পায়া ভারি হয়েছে বাবা। নটবরকেই ডেকে পাঠাও না ?"

"আজকের দিনটা দেখি। কাল তাই ডাকব।" বলে শশধর মোটরে চেপে আপিস গেলেন।

উড়িয়া ঠাকুর নটবরের সঙ্গে গগনের পার্থক্য অবশ্য অনেকখানি, নইলে আর এভাবে বার বার ডেকে পাঠিয়ে অপেক্ষা করা কেন। গগনকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কত লোক খাবে আর কি খাবে ব'লে দিলেই গগন ফর্দ ঠিক করে দেয়, হিসাবে তার কখনো ভুল হয় না। জিনিস কম পড়ার বিপদ আর অপচয়ের আপসোস, কোনোটাই সে ঘটতে দেয় না। রান্না গগনের খারাপ হয়েছে এমন

কথা কোনোদিন কারো মুখে শোনা যায় নি। মধ্যাহ্নের নিমন্ত্রিতদের বেলা পাঁচটায় আসনে বসানো তার স্বভাব নয়। থাকে সে পরিচ্ছন্ন, কাজও করে পরিষ্কার। রান্নাঘরেই হোক আর অস্থায়ী চালার নিচেই হোক, তার রান্না করা দেখে অত্যন্ত যে খুঁতখুঁতে মানুষ তারও খিদে কমে যাবার ভয় থাকে না।

তাছাড়া, মানুষটা সে জানাশোনা। কয়েক মাস সে এ বাড়িতে কাজ করেছে। বেলারানীর বিয়ে হল পৌষের শেষে, তার আগের শ্রাবণের শেষে গগন চাকরি করতে এল নটাকা বেতনে। শ্রাবণের পর ভাদ্র, ভাদ্রমাসে বিয়ে পৈতে কোনো শুভকর্ম হয় না। পেশাদার ঠিকে বামুনরা কারো বাড়িতে যদি বাঁধা কাজ করে তো করে বছরের ওই একটি মাস, বসে থাকার বদলে থাকা খাওয়া আর বেতন পাওয়া যায়, অন্য সময় এ কাজ তাদের পোষায় না। আশ্বিন মাস সুরু হতে না হতে ডাক আসতে লাগল নানা জায়গা থেকে, গগন কিন্তু কাজ ছাড়ল না। যে বৌ নেই তাকে মেরে, যে ছেলে কস্মিনকালে ছিল না তার অসুখ ঘটিয়ে এবং আরও কয়েকটা মিথ্যা ছুতোয় ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দুএক জায়গায় রেঁধে এসে সামান্য যে উপরি রোজগার হল তাতেই সে যেন খুশি হয়ে রইল। বিদায় সে হল বেলারানীর বিয়ের ভোজ রেঁধে। বাড়ির বামুনের বাড়তি পাওনা হয় না, এই হিসাব ধরে শশধর তাকে বখসিস্ দিতে গেলেন দুটি টাকা। গগন দাবী করল দশ টাকা। টাকা দুটি নিয়ে কোমরে গুঁজে দাবীটা জানিয়ে রাগ করে সে বিদায় হয়ে গেল।

বিকেলে দেখা গেল, শশধর গগনকে একেবারে গাড়িতে চাপিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আপিস থেকে ফিরে ঘরোয়া জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে শশধরের ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। গগনকে বসিয়ে তিনি

প্রস্তুত হতে গেলেন, বেলারানী খবর পেয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ওপর থেকে নেমে এসে বললে, 'তোমার কেমন ধারা বিবেচনা গগন? না পারলে বলে দিলেই হত আসতে পারবে না, তুমি ছাড়া কি ঠাকুর নেই দেশে?"

"আমার মতো নেই। কেমন আছ দিদিমণি?"

মুখে জবাব দেবার দরকার নেই বলেই বেলারানী যেন নিজেকে জবাবের মতো সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। বিয়ের পর, ছেলে বিয়োবার পর, বেলারানী একেবারে বদলে গেছে। বিয়ের সময় তার চেহারাটি ছিল রুগ্ন বালকের মতো। সোনার হার অনায়াসে এদিক ওদিক দোল খেত। ছেলেটা এসে তাকে এমন করে দিয়েছে যে দেখলে মনে হয়, এখনো সে মা হয়নি, হতে চায়। ক্রমে ক্রমে পাওয়ার বদলে হঠাৎ পাওয়া এই সম্পদ নিয়ে বেলারানী আর বাঁচে না, তাকে চটিয়ে দিয়েও রাস্তার লোকের পর্যন্ত তাকিয়ে যাওয়া চাই। "মরণ তোমার!"—বলে অভিশাপ দিয়ে সরে যাবার সুযোগ না পেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। বাপের বাড়ি এসেই বেলা সকলের আগে পাড়ার চেনা মানুষদের বাড়ি ঘুরে এসেছে, বিয়ের আগে তেরো বছরের ছেলের মতো আঠারো বছরের নিস্ব বেলাকে দেখে যারা না জানি কি ভাবত! বিশেষভাবে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনেছে সেই সব বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সঙ্গিনীদের, যাদের হাসাহাসি তার রক্তকে তেতো করে দিয়েছিল। বিয়ের পর, ছেলে হবার পর, গগনও তাকে আর দেখে নি। ব্যাকুল হয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে বেলারানী ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলছে। বুক দুরদুর করছে বেলারানীর। গগনের কি চোখ নেই? তাকে জিজ্ঞেস করা, সে কেমন আছে! তবে হ্যাঁ, অনেক দেরিতে দেরিতে পলক পড়ছে বটে গগনের চোখে, দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে কি যেন সে মাপিয়ে দিচ্ছে সারা গায়ে, গা যাতে শির শির করে।

"ছবির মতো দেখাচ্ছে তোমায় দিদিমণি।" চাপা গলায় বেসুর আওয়াজে গগন বল্‌ল।

"মরণ তোমার!" অভিশাপ দিয়ে হেসে বেলারানী ওপরে নিজের ঘরে গেল। গগনের একটিমাত্র বেয়াদপি মাপ করবে, আগেই তার ঠিক করা ছিল। তার বেশি আর কিছু নয়। এই বেশ হয়েছে। গগন ভাববে, জয় আমার বাবরি চুলের, দিদিমণি আমায় ভোলে নি! ভুলেছে কিনা দেখিয়ে দেবে বেলারানী। এমন স্পর্দ্ধা একটা রাধুনী বামুনের, একবার দেখা করতে আসে না দেড় বছরের মধ্যে, মুনিব-কন্যা তাকে মনে রেখেছে মনে করে!

শশধরের সঙ্গে বেলার মা-ও এলেন পরামর্শের জন্য। বল্‌লেন, "পারবে তো গগন? লোক কিন্তু খাবে অনেক।"

সফল শিল্পীর সুবিনীত অনুদার আত্মগরিমাকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দিয়ে গগন বল্‌ল, "পরশু চিৎপুরে দুহাজার লোক খাইয়ে এলাম মা। বাবু মনভোলা মানুষ, আগের দিন রাত দশটায় আমার হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেললেন, 'কি হবে বাবা গগন, আয়োজন করেছি হাজার লোকের, লোক যে খাবে দুহাজার!' আমি বল্‌লাম, "বাবু, আমি থাকতে ভাবছেন? মোটে হাজার লোক বেড়েছে, বলুন না আরো দুহাজার লোককে"—

শশধর বল্‌লেন, "বাইরের লোক খাবে শ' চারেক। বিশজন বেশি ধরাই ভালো—চার শ' কুড়ি জন। ঘরের লোক হবে"—

বেলার মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি করলে গগন? একেবারে হাজার লোক ভুল! কি বিপদ, মাগো!"

ঝির কোলে বেলারানীর ছেলে। পরিপুষ্ট নধর শিশু, পেটেন্ট ফুডের বিজ্ঞাপনের ছবির মতো। সাত আট মাসের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বেশিক্ষণ ঘুরতে ঝি বেচারির বোধহয় রীতিমত কষ্ট হয়।

"দিব্যি পুষ্টু খোকা, মা।"

"ও আবার কি কথা গগন ? অমন করে বলতে আছে ?"

"আমি বল্‌লে দোষ হয় নাগো, মা'ঠান। আমার বলা হল গিয়ে আশীর্বাদ—বামুনের ছেলে বটি তো।"

খোকাকে কোলে নিয়ে গগন মুখে নানারকম আদরের শব্দ করে। খোকার নতুন শেখা ফোকলা হাসি তার লাগে বেশ। মনে হয় এ যেন তার চেনা খোকা। কোনোরকম পরিচয়ের ভূমিকা ছাড়াই তাই একেবারে হাসাহাসি সুরু হয়ে গেছে। নাকটি একটু বোঁচা খোকনের, ডগা বলা চলে এমন কিছু নেই। চোখের বাইরের কোণে স্পষ্ট ভাঁজ আর রেখা আছে। কানের পাতা দুটি মাথার সঙ্গে লেপ্‌টান। মনে হয় যেন আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে, আপনা থেকে গজায় নি। বেলার মা বল্‌লেন, "আট মাসে জন্মানো ছেলে। বলতে নেই, ছেলে দেখে সবাই তো অবাক। ডাক্তার বল্‌লে, হিসেবে ভুল হয়েছে, এ ছেলে দশ মাসের। কি কথা মুখপোড়া ডাক্তারের ! মেয়ের আমার বিয়ে হল দশ না এগার মাস"—

শশধর এসে পড়েছিলেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা। ওসব কথা থাক। কাগজ কলম আনো দিকি, ফর্দটা করে ফেলি।"

খোকাকে গগন তাড়াতাড়ি কোল থেকে মেঝেতে বসিয়ে দিল, অস্পৃশ্যকে বর্জন করার মতো। ঠোঁট ফুলিয়ে খোকা করল কাঁদবার উপক্রম। খোকার চিবুকের মাঝামাঝি একটু খাদের মতো আছে। পায়ের দুনম্বর আঙুল দুটিও কি একটু খাপছাড়া রকমের বড় নয় খোকার ?

"কি যে তুমি কর গগন ! কোল থেকে ছেলে নিলে, কোলে তো দিতে পারতে ? মাটিতে নামালে কোন বিবেচনায় ?"

বেলার মা তাড়াতাড়ি নাতিকে কোলে তুলে নিলেন।

আড্ডা-বাসায় সে রাত্রে তাস খেলা জমল না। পিছন দেখে চিনতে পারা যায় এমন রঙচটা দাগ লাগা তাস, তাই নিয়ে খেলতে খেলতে দুদিন আগেও পঙ্কুর সঙ্গে গগনের হাতাহাতি হয়ে গেছে। আজ সাড়ে পাঁচ আনা হেরে যাবার পর কানাই সন্দিগ্ধ হয়ে বললে, "ব্যাটার লেগে মন কাঁদে নাকি রে গগন? তা কি কর্‌বি বল, এ্যারে কয় কপাল। তোর ব্যাটা বাপ বলবে অন্যকে।"

ভুম খাওয়া গগন বললে, "থুক্। ছুঁতে ঘেন্না করে, মন কাঁদবে! আগে জানলে কি কোলে নিতাম? আমার হোক, যার হোক, বেজন্মা বটে তো। বামুনের ছেলে, ঘেয়ো কুত্তার গা চাটবে তো বেজন্মার ছাঁয়া মাড়াবে না। শাস্তরে আছে।"

জীবনে প্রথম আসল রক্তে খাঁটি আগুন ধরে যাওয়ায় গগন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বিয়ের আগে তার রক্তকে বেলারানী যেন শুধু দাহ্য পদার্থে পরিণত করে রেখেছিল, স্ফুলিঙ্গের অভাবে আগুন ধরাতে পারে নি। এবার একেবারে মশাল ছুঁইয়ে দিয়েছে।

প্রথমে বোঝা যায় নি। বিকালে টের পাওয়া গিয়েছিল শুধু ঝাঁঝ আর কিছু নয়। তা, অমন ঝাঁঝ পথে ঘাটে কত লাগে। লক্ষ্মীও একদিন লাগিয়েছিল এবং এখনও তার জের চলেছে। কে জানত, তাপের চেয়ে আগুন এত বেশি গরম!

দেবতার মতো, মানুষের মতো আর পশুর মতো একনিষ্ঠ মতি। গত্যন্তর না থাকার সামিল দুরবস্থা। প্রথম থেকে বেলারানী যদি এইরকম হত, গগন এমন ব্যাকুল হত কিনা সন্দেহ। সে হত জানা কথা, একবার যা জীবনের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল আরেকবার তাই শুধু চোখে দেখা।

পাড়ায় একদিন বিয়ে হল বেলারানীর গা-জালানো মোটাসোটা

রূপসী একটি মেয়ের, বাসর থেকে বেলারানী এল খালি বাড়িতে, বিনা ভূমিকায় আশ্রয় করল মেঝেতে বিছানো গগনের ময়লা বিছানা। গগন খানিক বুঝল, খানিক বুঝল না। সার্ট কিনে গায়ে চাপাল, চুল আঁচড়াতে লাগল সযত্নে, একদিন অন্তর কামাতে লাগল দাড়ি। নিজেকে মনে হতে লাগল কোনো এক দিগ্বিজয়ী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। পোকায় ধরা জীবন্ত বাঁশের কঞ্চি মনে হোক, মুনিব শশধরের মেয়ে তো বেলারানী।

কি মেজাজ সে মেয়ের, কি তেজ! একজনের দাপটে সারাটা দিন বাড়ির মানুষ যেন তটস্থ হয়ে থেকেছে। গগনকেও সে যে রেহাই দিত তা নয়। রাত দশটায় খেতে বসেই হয়তো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে, "এই ঠাকুর! এই হনুমান! কত নুন দিয়েছ ডালে?"

অন্য কারো কাছে ডাল নুনকাটা লাগেনি। প্রতিবাদ জানাতে সামনে এসে থালার দিকে তাকিয়ে গগন হেসে বলেছে, "পাতের নুন মেখে ফেলছ দিদিমণি।"

"তোমার মুণ্ডু করেছে দিদিমণি। কদ্দিন না তোমায় বলেছি মুখের ওপর জবাব দেবে না? দূর করে দেব, বজ্জাত কোথাকার।"

পরদিন নিজেই দূর হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে গগন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ির শেষ জাগা মানুষটির সাড়াশব্দ শেষ হবার আগেই হয়তো এসেছে বেলারানী। জিদ নেই, তেজ নেই, অহংকার নেই—ভিখারিণীর মতো।

অপরিপুষ্ট শরীরটির জন্য শুধু ভিখারিণী অভিসারিকার মতো অবশ্য, অন্য বিষয়ে তার একগুঁয়েমির বিকার সে সময়েও সমান জোরালই থাকত।

"সব জেগে আছে। কেউ যদি বাইরে আসে?"

"আসুক। কি আর হবে, জানবে। আমি ডরাই না।"

তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে : "আমায় তোমার পছন্দ হয় ? সত্যি পছন্দ হয় ? দেব গো দেব, টাকা তোমায় দেব, মাইনের তিনগুণ টাকা দেব। আগে বলো না, কেমন ধারা পছন্দ হয় আমাকে ? একটুখানি ? তার চেয়ে বেশি ? খুব বেশি ?"

এক মাসের মধ্যে সব ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, মনিব-কন্যা যদিও রাজকন্যারই শুরের, তবু আর ভালো লাগত না। সময়মতো বেলারানীর বিয়ে না হলে গগন হয়তো নিজে থেকেই চাকরি ছেড়ে পালাত।

ভোজের আগের দিন রাত্রেই গগন হাতা খুন্তি নিয়ে শশধরের বাড়িতে হাজির হল। শেষরাত্রে চুলোয় আগুন পড়বে। সহকারী দুজনকে তার সঙ্গে আনা উচিত ছিল, কতগুলি অকথ্য যুক্তি দেখিয়ে তাদের সে আড্ডা-বাসাতেই রেখে এসেছে। রাত তিনটেয় পঞ্চু ও কানাইকে হেঁটে এতদূর আসতে হবে; দেরি তারা করবে সন্দেহ নেই। বাড়ির সকলে অসন্তুষ্ট হল, বেলারানী পর্যন্ত।

"তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই গগন।"

"আমি থাকতে ভাবছ দিদিমণি ?"

আত্মীয় পরিজন এসে পড়েছে, বাড়ি আজ রাত্রেই সরগরম। বারান্দার একদিকে সাতটি বঁটি পেতে সাতজন স্ত্রীলোক তরকারি কুটছে, ঘিরে বসে আছে আরও পাঁচ সাত জন; তাদের আলাপ আলোচনায় সেখান থেকে উঠছে হাটবাজারের কলরব। বালিশ আর সতরঞ্চির বিছানা বগলে নিজের আগেকার শোবার কুটরিতে গিয়ে গগন দেখল, সেখানে চৌকি পেতে শশধরের নিজের লোকের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিছানার পুঁটলি নামিয়ে রেখে বেলারানীর খোঁজে সে দোতলায় গেল। অন্য সব ঘরে গাদাগাদি করে মানুষ ঘুমবে, শুধু বেলারানীর ঘরটি বাদ পড়েছে। জামাই এসেছে অনেক দিন পরে, মস্ত ঘরের

একপাশে খাটের বিছানা শুধু সে আর বেলারাণীর জন্য। খোকা ঘুমিয়ে আছে মেঝেতে, লাল মশারির নিচে।

"আমি কোথায় শোব দিদিমণি?"

"তাও আমাকে বলে দিতে হবে? যেখানে জায়গা পাবে শোবে যাও বাপু, আজ রাতে আর আরাম করে শোয় না।"

"ঘুপচি টুপচি যেখানে দেবার দাও দিদিমণি,শোব কিন্তু আমি একলাটি। কেউ থাকবে না সেথা।"

চাপা গলায় গগনের কথা বলার ভঙ্গিটা আবেদনের নয়। তুনম্বর অতি তুচ্ছ বেয়াদপিতেই বেলারানী রাগ করবে ঠিক করে রেখেছিল। হাসি পাওয়ায় ইচ্ছা থাকলেও রাগ দেখাতে পারল না।

"তুমি তো বড় নবাব হয়েছ গগন?"

"রান্না ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে—"

"কোথাও খালি নেই। কিষণলাল আর মেজমামার চাকরটা বাইরের ঘরে শোবে, সেইখানে শোওগে।"

রাত্রি আরও গভীর হয়ে এলে বেলারানী যখন সংকোচ জয় করে ঘরে গিয়ে দরজা দেবে ভাবছে, গগন সিঁড়ির মাথায় পাকড়াও করল।

"আমি ছাতে গিয়ে শুলাম দিদিমণি।"

"হিমের মধ্যে ছাতে শোবে?"

"ছাত ফাঁকা হবে। কেউ যাবে না।"

ঘরের মধ্যেই চাদর গায়ে দিলে আরাম বোধ হয়, খোলা ছাতে বেশ ঠাণ্ডা। কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলি আবছা হয়ে গেছে। সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে বসে একঘণ্টা গগন বিড়ি টানল। মাঝরাত্রি এতক্ষণে পার হয়ে গেছে। নিচে থেকে আর মানুষের গলা কানে আসে না। এইবার বেলারানীর আসার সময় হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি আসাই ভালো, রাত তিনটের সময় বাড়ির

মানুষেরা আজ হয়তো আবার জাগতে আরম্ভ করবে। আধঘণ্টা পরে গগন একবার নিচে থেকে ঘুরে এল। নিচের বারান্দায় এখনো কয়েকজন অনুগ্রহপ্রার্থিনী বিধবা তরকারি কুটছে, ঘুমে ও শ্রান্তিতে মুখে তাদের কথা নাই। দোতলায় বেলারানীর ঘরের দরজা বন্ধ।

এবার সতরঞ্চিতে শুয়ে গগন বিড়ি টানতে লাগল। উনানের আঁচ সয়ে সয়ে গায়ের চামড়া বোধহয় বিগড়ে গেছে, সামান্য ঠাণ্ডাতেই বড় কষ্ট হতে লাগল। জ্বর এসে শীত করার মতো!

রাত জেগে ঘুমিয়েছে বেলারানী, তবু সে উঠল খুব ভোরেই। বাড়ির প্রায় সকলেই অবশ্য তখন উঠে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে বেলারানী নিচে নামতে না নামতে কোথা থেকে গগন এসে দাঁড়াল।

"খোকা ঘুমোচ্ছে দিদিমণি, তোমার খোকা?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"একবারটি কোলে নিতাম?"

"নিও। ঘুম ভাঙ্গলে নিও।"

শিথিল শ্রান্ত বেলারানী হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ছিটকে সরে গেল।

ধোপ দুরস্ত কাপড়ে মালকোঁচা এঁটে, কোমরে গামছা বেঁধে, বাবরি চুল সামলাতে মাথায় একটুকরো লাল সালুর ফেটি জড়িয়ে গগন প্রকাণ্ড হাতা দিয়ে ডেকচির ভেতরটা নাড়তে থাকে, চেনা মানুষ কাছে এসে খাতির করে বলে, "কেমন আছ গগন?"

হাতা খুন্তি নাড়া চাড়া সুরু করেই গগনের মুখে সফল শিল্পীর অন্নদার আত্মগরিমার ছাপটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সহকারী পঞ্চু ও কানাই উঠছে বসছে তারই হুকুমে। পঞ্চু বয়সে বড়, একটু রোগা এবং বাঁকা, কপালে তোলা গাঁজাখোরের চোখ, নেশা কিন্তু তার দেশি মদের। কানাই-এর বাড় কিশোর বয়সেই বন্ধ হয়ে গেছে, মুখের ক্ষেতে গোঁফ-

দাড়ির ফসলে তার দারুণ অজন্মার লক্ষণ। গগনের প্রতিভাগত অসংযমের সংকট কিন্তু সেই সামলে চলে। মাঝে মাঝে গগনের ঝোঁক চাপে পুরানো খাদ্যে নতুনত্ব আনবে, এমন স্বাদ সৃষ্টি করবে মানুষের জিভ যার পরিচয় জানে না। হঠাৎ-জাগা উৎসাহে ও উল্লাসে একটানে হাতের বিড়িটা চড়চড় শব্দে আধখানা পুড়িয়ে সে বলে, "খেয়ে যদি সবাই পাত না চাটেরে কানাই, বাপ আমায় জন্মো দেয় নি।"
কানাই তখন সৃষ্টি-পূর্ব সমালোচকের মতো মাথা নেড়ে বলে, "উহুঁক। সেটি হবার নয়। কালিয়া যদি না কালিয়া হবে তো গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবে।"
গগন তা জানে, অভিজ্ঞতাও আছে। কেবল মনে থাকে না। খাবে অন্য লোকে, উপভোগ তাদের বলে পছন্দ অপছন্দের অধিকারটাও তাদেরই, তবু তাদের বৈচিত্র্য পরিবেশনের সুযোগ না পেলে সব যেন কেমন একঘেয়ে মনে হয় গগনের। কখনো সে মুষড়ে যায়, কখনো রাগের জ্বালায় থুক্ করে থুথু ফেলে দেয় মাছ তরকারির পাত্রে।
বলে, "স্বাদ হবে।"
কোনের ছোট উহুনে বেলারানীর মাসি পায়েস রাঁধতে এলেন, খোকার মুখে দেবার পায়েস। সঙ্গে এল বেলা। ইতিমধ্যে আরেকবার কাপড় বদলে সে তাঁতের কোরা কাপড় পরেছে, সাবান মেখে করেছে স্নান। রান্নার গন্ধ পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছে তার গায়ের তেল সাবানের গন্ধ।
"মন দিয়ে রেঁধো গগন। রান্না ভালো হলে আমি তোমায় একটাকা বখশিস দেব।"
ঘণ্টাখানেক পরে আরেকবার সে এল। একা।
"কি কি নামালে গগন? পোলাওয়ের রঙ তো খোলেনি। জাফরান দাওনি বুঝি? বল্‌লাম যে দিতে?"
চারিদিকে একনজর তাকিয়ে—

"এত আগে বেগুন ভেজে রাখলে কেন ?"

বিয়ের আগে দিনের বেলার দাপটের সঙ্গে তার আজকের কর্তালির তুলনাও চলে না, কিন্তু সে দাপটের ধরন ছিল ভিন্ন। টিবিয়ে টিবিয়ে গা-জ্বালানো কথা বলার কায়দাটা সে বিয়ের পর আয়ত্ত করেছে। সে চলে গেলে গগন বললে, "শুনলি কানাই ? দেমাক দেখলি ?"

বন্ধুর বদলে কানাই কিন্তু বেলারানীকেই সমর্থন করল। "তা, দেমাক ভাই করতে পারে।"

গগন কথাটি না বলে মুনের পাত্র হাতে তুলে নিল। কানাই তাকে চিরদিন সামলে এসেছে, আজ ঝোঁকটা কোন দিক থেকে এল ঠিক ধরতে না পারায় তার ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠল না। হতভম্বের মতো সে শুধু জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "ওকি হচ্ছে ? ওকি করছিস গগন ?"

ছোট ছেলেমেয়েরা খেতে বসল আগে। বেগুন ভাজা ছাড়া সব কিছুই মুন কাটা, মুখে দেওয়া যায় না। বেগুন ভাজায় মুন ছড়িয়ে দিতে গগনের খেয়াল ছিল না।



নীরদ ঘোষাল এককালে বড় অত্যাচারী ছিল। প্রচুর মদ খেত কিন্তু মাতাল নিয়ে যাদের কারবার সে সব স্ত্রীলোক তার পছন্দ হত না। ভালো অবস্থায়, মত্ত অবস্থায় এ জগতে তার কাছে একমাত্র স্ত্রীলোক ছিল তার স্ত্রী। এ নিয়ে সে রীতিমত গর্ব অনুভব করত। মাতাল কিন্তু চরিত্রহীন নয়, এমন মানুষ কটা আছে এ জগতে!

প্রায়ই মাঝরাত্রে অনুরূপার চাপা কান্নার গোঙানি ও হঠাৎ বাতাস-চেরা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে শুনতে প্রতিবেশীদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বেশি রাত্রে নীরদ বাড়ি ফিরেছে টের পেলে পাশের বাড়ির মেয়েপুরুষ কান পেতে থাকত। চোখের আড়ালে মাঝরাত্রির ওই মর্মান্তিক অভিনয় তাদের কল্পনায় এক ভয়াবহ রহস্য হয়ে উঠেছিল, অনুরূপার আর্তিগুলি তাদের সর্বাঙ্গে কেমন একটা অকথ্য অনুভূতির সাড়া জাগিয়ে তুলত: প্রত্যেকে নিজের মধ্যে অমানুষিক নির্মমতার

আনন্দ উপভোগ করত। বেশি পরিমাণে পচনশীল খাদ্য বাড়িতে এলে পাড়ায় বিলি করার প্রথা আছে। নীরদ যেন আশেপাশের কয়েকটা বাড়ির স্তিমিত নিস্তেজ একঘেয়ে জীবনে তার উৎকট উল্লাসের স্বাদ পাঠিয়ে দিত।

সে-সব দিন গেছে।

আপনা থেকেই গেছে। নীরদ আর মদ খায় না। হৃদয় আর মনটা তার নরম হয়ে গেছে সত্য কিন্তু সেটা কাউকে মদ ছাড়তে সাহায্য করে না। মদের স্বাদটাই তার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। দেহ-যন্ত্র খারাপ হয়ে নয়, তার বিশাল দেহটা বরং আগের চেয়ে শক্তিশালীই হয়েছে এখন—মাথায় তার স্বাদ লাগে না মদের। মদ খেলে কেমন সে শিথিল অবশ হয়ে যায়, সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপে, মাথাটা সর্বক্ষণ আছড়ে পড়তে চায় বুকে। দুর্বল শীর্ণকায়া অন্নপূর্ণার সেবা আর সাহায্যই তখন শুধু তার প্রয়োজন হত। অথচ মদ না খেলে অন্নপূর্ণার প্যাঙাসে মুখখানা অত্যাচারে রক্তিম করে দেবার ক্ষমতা তার এখনও আছে।

নীরদ একটা কৈফিয়ৎ দেয়।—শোনায় উপদেশের মতো!

'ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে ওসব ছাড়তে হয় পুরুষ মানুষকে।'

'লুকিয়ে একটু আধটু—?'

'লুকিয়ে? আরে রাম!'

আপনা থেকেই গেছে। হৃদয় মন নরম হয়ে এলে পারিবারিক জীবনটা তার বড়ই ভালো লেগে গেল। গোড়ার ছেলেমেয়েগুলি বড় হয়ে ওঠায় নতুন জীবনের বিকাশমুখর পরিবারটিও তখন তার সত্য-সত্যই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। লেখা-পড়া, গান-বাজনা, খেলা-ধুলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, অভাব-অভিযোগ, আবদার-আহ্লাদের সে কি সমারোহ বাড়িতে! মুগ্ধ হয়ে গিয়ে নীরদের মদের পরিমাণ কমতে

লাগল, বাদ পড়তে লাগল। তারপর একবার টাইফয়েডে ভুগে উঠে সে দেখল মদের স্বাদ তার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। শরীর সুস্থ ও সবল হল, শরীরে স্বাস্থ্য ও শক্তি এল, কিন্তু মদ খেতে গিয়ে নীরদ দেখল, মাথায় তার নেশাটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মদ ছাড়লেও তার কৈফিয়ৎ দিতে হয় মানুষকে। নীরদ একটা কৈফিয়ৎ তৈরি করে নিল। বলবার সময় শোনাল উপদেশের মতো।—

"ছেলেমেয়ে বড় হলে ওসব ছাড়তে হয় পুরুষ মানুষকে।'

নীরদের কাছে যারা বিনামূল্যে মদ পেত তারা অনেকদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে পিছু লেগে রইল। এমন কি নীরদকে আবার নেশাটা ধরিয়ে দেবার জন্য নিজেরা পয়সা খরচ করে মদ কিনে অন্য ছুতায় তাকে বাড়িতে ডেকে বলতে লাগল, 'লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধদিন—'

'লুকিয়ে চুরিয়ে? আরে রাম রাম!'

এক বাড়িতে থেকে নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে যে বেশ একটা মোটারকম ব্যবধান ছিল এটা আবিষ্কার করে কি আশ্চর্যই যে হয়ে গেল নীরদ! আনন্দে গদগদ হয়ে সে বলতে লাগল নিজেকে, তাই বটে, তাই বটে! একটু এগিয়ে গেলেই অনেকটা ফস্‌কে যায়। নিজের জীবনের অঙ্গ বটে তো সব! ইস্! মেয়েটা ম্যাট্রিক দেবে সামনের বছর! ম্যাট্রিক!

মেয়েটাই প্রথম সন্তান। নাম চারু। অনুরূপার সরু কাঠির মতো দেহ থেকে সে যেন বেরিয়ে এসেছে নতুন একটি সংস্করণের মতো, রোগার বদলে ছিপছিপে হয়ে। মায়ের প্যাঙাসে মুখের গড়নটি শুধু পায় নি, চিবুকের অভাব ঘটে গেছে।

চারুর সঙ্গেই নীরদের ঘনিষ্ঠতা সকলের চেয়ে বেশি। চারু একটু একটু বড় হয়েছে আর অনুরূপা প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু একটু করে বাপের সেবার ভার তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। মনের

আড়ালে যে বিরোধ ও বিতৃষ্ণা জমেছে অনুরূপার সেটা একদিনের সঞ্চয় নয়, নিজে সে. ভালো করে জানেও না যে প্রয়োজন ও অভ্যাস ছাড়া স্বামীর কাছে যাবার তাগিদ সে কখনো অনুভব করেনা। মেয়েকে বাপের সেবা শেখান যে তারই বিদ্রোহের প্রকাশ, এটা কল্পনা করার ক্ষমতাও অনুরূপার নেই। দূরে যাবার, তফাতে থাকার তাগিদ যে অহরহ তার মধ্যে জেগে আছে, অনুরূপা তা জানে না, জানলেও বিশ্বাস করবে না।

বাবার জন্য ছোট বড় কাজগুলি করে যাওয়া চারুর জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে জড়িয়ে গেছে। বড় হওয়ার সঙ্গে যা কিছু বেড়েছে চারুর জীবনে বা নতুন এসেছে,সব মানিয়ে নেওয়া হয়েছে এই কর্তব্যের সঙ্গে। চারু ভাবে না যে বাবার জন্য দশবার উঠে আসতে হওয়ায় পড়ায় তার ছেদ পড়ল। দশবার উঠে আসার ফাঁকগুলিই তার পড়ার জন্য। সংসারের কাজে মা তাকে প্রায় ডাকেই না, সেটা অবশ্য তাকে পড়া করা আর গান শেখার সুযোগ দিতে। কিন্তু বাবার কাজ আলাদা, সংসারের কাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। চা করা, খাবার করা, ভাত রাঁধা, সংসারের কাজ, ওসব মা করে। চায়ের কাপ, খাবারের রেকাবি, ভাতের থালা বাবার সামনে পৌছে দেওয়া তার কাজ। বাবা জল চাইলে মা কলসী থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত করতে পারে, বাবাকে গেলাসটা কিন্তু দিতে হবে তাকেই। বাবার জামা-কাপড়, পোষাক-পরিচ্ছদের হিসাব রাখা, বই-খাতা-কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখা, বিছানা পাতা, চটি এগিয়ে দেওয়া, বাতাস করা, ঘামাচি মারা ইত্যাদি যত কিছু করা দরকার সেগুলি করার জন্য চারু জন্মেছিল পৃথিবীতে।

নীরদকে যেমন ভয় করে, তেমনি ভক্তি করে চারু। প্রতিদিনের চলতি সেবার অতিরিক্ত কোনো সেবা করার সুযোগ পেলে সে যেন

কৃতার্থ হয়ে যায়। নীরদের ছোট-খাট অসুখ হলে সে উদগ্রীব, উৎসুক হয়ে থাকে—যা কিছু করার আছে তারও বেশি কিছু করার সাধ চাপা উচ্ছ্বাসের মতো তার ছোট বুকটিতে ঠেলে উঠতে চায়। নীরদ চোখ বুজে পড়ে থাকে সামান্য অসুখের ধাক্কায়, চারু তার ভারিক্কি প্রৌঢ় মুখে ক্ষমতা, শাসন ও মমতায় গড়া মৃদু ভয়ংকর রহস্য দেখে দেখে মনের মধ্যে বিহ্বল হয়ে যায়।

অথচ আদুরে মেয়ে সে নয়। সে প্রথম এবং বড় বটে কিন্তু অনেক গুলির বড়। ভাইবোনের বন্যায় তার অতিরিক্ত আদরের দাবি গোড়ার দিকেই ভেসে গেছে। নীরদ তাকে কোনোদিন বেশি প্রশ্রয় দেয় নি, নির্ভরশীলতা যদি প্রশ্রয় না হয়। প্রধান সেবিকা বলে বরং শাস্তি ও শাসনটাই বাপের কাছে সে পেয়েছে বেশি।

তবে পরিচয়টা তাদের হয়েছে গভীর। মুখের ভাবের একটা ভিন্ন ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেছে দুজনের অনৈতিক সহানুভূতিতে। চারুর চোখ ভেজা দেখলে নীরদ তাকে আদর দিয়ে ভোলায় না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে রে?'

চারু তখন কাঁদে না, অভিমানের জের টানে না কিন্তু বলে, 'কাপড় নেই। মা বকেছে বাবা।'

নীরদ সত্যই রাগ করে। বলে, 'কাপড় নেই! এই না সেদিন একজোড়া কাপড় কিনে দিলাম তোকে, দুমাসও হয় নি। অত কাপড় দিতে পারব না তোমাকে। অত নবাবকন্যা হলে চলবে না তোমার।' খানিকক্ষণ একদৃষ্টে মেয়ের মুখখানা দেখে আবার সজোরে মন্তব্য করে, 'লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!'

কিন্তু কাপড় চারু পায়! ছুটির দিন সেবার প্রয়োজন ছাড়াই কাছাকাছি একটু এদিক ওদিক নড়ে চড়ে বেড়ালেই নীরদ তাকে সঙ্গে করে কাপড়ের দোকানে নিয়ে যায়।

কাপড় পছন্দ করে চারু নিজেই দাম জিজ্ঞাসা করে। দাম শুনে বলে, 'বাব্বা! সস্তা দেখে দিন।'

নীরদ বলে, 'নে নে, ওটাই নিয়ে নে। জ্বালাস নে আর।'

স্কুলের পরীক্ষাগুলি চারু এমনিই পাশ করে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটা পাশ করিয়ে দেবার জন্য শেষ বছর একজন মাষ্টার রাখা হল। অন্নরূপা বলেছিল, 'সম্বন্ধ খুঁজে বিয়ে দিয়ে দিলে হয়। বোকা হাবা মেয়ে যদি না পাশ করতে পারে?'

নীরদ বলেছিল, 'বিয়ে! ওইটুকু মেয়ের বিয়ে কি গো! পড়ছে, পড়ুক।' অন্নরূপা তর্ক করে না, কথা কাটায় না। মেয়ের বিয়ের মতো বড় কথা বলেই সে বলল, 'মেয়ে তোমার ওইটুকুই আছে। দুবছর বয়েস ছাপিয়ে ভর্তি করেছিলে মনে নেই? বছর বছর টেনে হিঁচড়ে ক্লাশে উঠেছে। কি হবে ওকে পড়িয়ে?'

তার পরেই চারুকে তালিম দেবার জন্য লোকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জগত ছেলেটি ভালো। কারণ, সে গরীব এবং নিজের চেষ্টায় অনেক কষ্ট সহ্য করে পড়াশোনা চালিয়ে এলেও বরাবর ভালো রেজাল্ট করে এসেছে।

জগত পড়ায়, চারুর মন পড়ে থাকে অন্দরে। 'দাঁড়ান, আসছি,' বলে থেকে থেকে সে উঠে যায় বাপের খুঁটিনাটি সেবা করতে। দিন সাতেক চুপ করে থেকে জগত প্রতিবাদ করল।

'পড়ার সময় বার বার উঠে গেলে চলবে না।'

'বাবার কাজ করতে যাই।'

'আর কেউ নেই বাড়িতে?'

'আমি ছাড়া কেউ পারে না।'

শুনে জগত আশ্চর্য হয়ে যায় কিন্তু অবস্থাটা মেনে নিতে রাজী হয় না। জগতের মতো ছেলেদের আবার বিবেক বলে একটা মনোধর্ম

থাকে, অনেক ভাবপ্রবণতা চাপা পড়ে যে বিকারটা সৃষ্টি হয়। সে তাই একদিন সোজা নীরদের কাছেই কথাটা পেড়ে বসে।

নীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'সে কি! পড়ার সময় সংসারের কাজ করতে উঠে যায়? ও তাহলে পাশ করবে কি করে?'

বহুদিন পরে অনুরূপা সেদিন ধমকের ধাক্কায় মাথা ঘোরা ও থর থর করে কাঁপবার অসুখে অসুস্থ হয়ে বিছানা নিল। নীরদ তবু গর্জে গর্জে শুনাতে লাগল, 'জানি, তোমার মতলব জানি'। মেয়েকে তুমি ফেল করিয়ে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে চাও। আমিও ভেবেছি কি না ওকে এম-এ টেযে পর্যন্ত পড়াব, শত্রুতা না করলে তোমার চলবে কেন।'

মেয়েকে ডেকে নীরদ বলে দিল, 'আজ থেকে তুই সংসারের কোনো কাজ করবি নে, শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকবি। ভালো করে পাশ করা চাই।'

'তোমার যে কষ্ট হবে বাবা?'

'বেশি পাকামি করিস নে চারু। কষ্ট হয় তো হবে।'

চারু অগত্যা মনকে সরিয়ে নিল পড়াশোনার দিকে এবং তার ফলে গুরুর প্রতিও একটু মনোযোগ তাকে দিতে হল। প্রথমেই তার খেয়াল হল যে দুবেলা তিন ঘণ্টা তাকে যে পড়ায় তার গোলগাল নিরীহ ভালোমানুষী মুখখানা আর যাই হোক একটি সুনির্দিষ্ট মানুষের মুখ। তারপর সে টের পেল যে লোকটা বই পড়েছে গাদা গাদা। তারও পরে সে নিজের কাছে স্বীকার করল যে লোকটা পড়াতে পারে অতি চমৎকার, পড়ানো শুনতে তার খুব ভালো লাগে।

মেয়ের সেবা আর নীরদ গ্রহণ করেনা, যতক্ষণ পারে নিজের কাছে রেখে তার মানসিক উন্নতির সাহায্য করে। জগতও যে শুধু স্কুলের পড়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, চারুর মানসিক উন্নতির

জন্ত তাকে অনেক বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান সরবরাহ করছে, নীরদের তা জানা ছিল না। সে যখন মাঝে মাঝে জগতের পড়ানো শুনতে ঘরে গিয়ে বসে জগৎ তখন মধ্যযুগের ব্ল্যাক ডেথের কাহিনী বন্ধ রেখে চারুকে ইংরেজি গ্রামার শেখায়, অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়। চারুকে বাড়তি জ্ঞান এবং আদর্শ ও উপদেশ সরবরাহের ভারটা তাই নীরদ নিজেই গ্রহণ করেছে।

চারু বুঝতে পারে, জগতের তুলনায় তার বাপের জ্ঞানভাণ্ডার বড়ই সংকীর্ণ, অনেক বিষয়েই জগতের মতো তার স্পষ্ট ধারণা নেই এবং কোনো বিষয়েই সে জগতের মতো সহজ ও স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারে না। জগতের বিরুদ্ধে চারুর মনে একটা প্রবল নালিশ জাগে। সে যেন তার বাবাকে অপদস্থ করছে, অবজ্ঞা করছে। সময় সময় মনের রাগ সে সামলাতে পারে না। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ খাপছাড়া মন্তব্য করে বসে, 'আপনার চেয়ে বাবা ঢের বেশি জানেন। কত পড়েছেন বাবা!'

'জানেন বৈকি। আমি আর কতটুকু জানি বল? বই কেনার পয়সা নেই, চেয়ে চিন্তে ধার করে পড়তে হয়, কত কষ্টে যে আমি লেখাপড়া শিখেছি, তুমি ভাবতেও পারবে না চারু।'

তা ঠিক। রাগ উপে গিয়ে চারুর মন সমবেদনায় ভরে যায়। সে ভাবে, জানুকগে জগত তার বাবার চেয়ে অনেক বেশি, আর তো কিছুই নেই ওর তার বাবার মতো! চাকরি নেই, পয়সা নেই, বাড়ি ঘর নেই, আপনার লোক নেই, কিছুই নেই!

চারুকে হাফ্ইয়ারলি পরীক্ষার সবগুলি সাবজেক্টে পাশ করিয়ে জগত নিজেও লেখাপড়া শেখার চরম পরীক্ষায় পাশ করে ফেলল, চাকরি সে একটা পেয়ে গেল চমৎকার। নীরদকে খবরটা জানিয়ে মাথা নিচু করে সে বলল, 'এতদিন আপনাকে বলবার মুখ ছিল না,

বলতে সাহস পাই নি। আজ একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই।'
কথাটা শুনে নীরদ চমকে গেল।—'তুমি! তোমার মধ্যে এসব আছে তা তো জানতাম না বাপু!'
জগত আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ছশো টাকায় ষ্টার্ট পেয়েছি—'
'আমার তাতে কি? আমি চারুকে পড়াব—এখন বিয়ে দেব না।'
'আজ্ঞে ও আর পড়তে চায় না।'
তার মেয়ে চারু, জগত আজ তাকে জানাতে এসেছে, চারু পড়তে চায় না! রাগে নীরদের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করে। নিজের জানা ও বোঝা অখণ্ড যুক্তি-তর্ক রীতি-নীতি যদি মিথ্যা হয়ে যায়, জগতের কথাই যদি সত্য হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত! চারুর মতামত না জেনেই কি জগত তার কাছে এ প্রস্তাব করার সাহস পেয়েছে?
কিন্তু তার মেয়ে চারু, তার আবার মতামত!
'তুমি আর এবাড়িতে এস না জগত।'
জগৎকে তাড়িয়ে দিয়ে নীরদ একেবারে চুপ করে গেল। চারুকে কিছুই বলল না। ধমক হোক, উপদেশ হোক কিছু একটা শুনবার জন্ম মেয়ে যে তার উৎসুক হয়ে আছে, বারংবার সেটা টের পেতে লাগল নীরদ। বুঝতে তার বাকী রইল না যে একবার কথাটা তুললেই চারু তার মনের কথা জানিয়ে দেবে এবং জানাবার জন্ম সে ছটফট করছে। তবু মনটা তার প্রতিদিন বিগড়ে যেতে লাগল মেয়ের মুখে তার মা'র মুখের প্যাঙাসেপনার আবির্ভাবের সূচনা দেখে। তবু নীরদ হাল যেন ছাড়তে পারল না। মেয়েকে আরও বেশি কাছে রেখে, তাকে পড়িয়ে, গল্প শুনিয়ে, বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, সিনেমা দেখিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল আগের অবস্থায়। কিন্তু কোনো দিক দিয়েই নাগাল সে যেন আর পেল না মেয়ের।

সর্বদা কি যেন ভাবে তার মেয়ে, কোথায় যেন পড়ে থাকে তার মন। তার কাছে থেকেও কোথায় সে যেন থাকে, যেখানে তার যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

জগত চাকরি করতে চলে গিয়েছিল, মাস তিনেক পরে ছুটি নিয়ে ফিরে এল। আবার সে চেপে ধরল নীরদকে।

'আপনি যদি ওকে পড়াতে চান, পড়াবেন যতদূর খুশি। আমি আপত্তি করব না। কথাটি বলব না।'

এবার নীরদ শুধু বলল, 'হুঁ।'

অনুরূপা খবর দিল, চারু আর স্কুলে যাবে না বলছে।

'কেন?'

'ও আর পড়বে না।'

'পড়বে না?'

'পড়বে—জগতের সঙ্গে বিয়ে দিলে পড়বে। পড়তে ওর ভয়ানক কষ্ট হয়, তবু বিয়ের পর তোমার মুখ চেয়ে পড়বে বলেছে।'

এবার নীরদ বলল, 'থাক, ওর আর পড়ে কাজ নেই। আজকেই স্কুলে নাম কাটিয়ে দিচ্ছি!'

স্কুলে চারুর নাম কাটাবার জন্য সেদিন নীরদ আপিস কামাই করল। রাত প্রায় এগারটার সময় বাড়ি ফিরে এল আগের মতো. মাতাল হয়ে।

চারু এখন বড় হয়েছে। কিছুদিন ধরে বাপের কাছে স্বাধীনতা পেয়ে এসেছে কল্পনাতীত। সে ভৎর্সনা করে বলল, 'ছি বাবা, ছি।'

নীরদ জবাব দিল না। কিন্তু অনুরূপা মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নীরদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল।



মৃগনয়নার চোখ দুটি সত্যসত্যই হরিণীর চোখের মতো। মানুষের অবিকল হরিণীর মতো চোখ থাকলে অবশ্য অকথ্য রকমের বিশ্রী দেখায়। কিন্তু ওটা তুলনা মাত্র; কোনো মেয়ের যদি বড়, টানা, সদাচকিত অথচ ধীর ও গভীর দৃষ্টিওয়ালা চোখ থাকে এবং চোখ দুটি দেখে হরিণীর চোখ মনে পড়িয়ে দেয়, সেই মেয়েটিকে মৃগনয়না বলা যায়।

মৃগনয়নার মনটি বড় কোমল। বিশেষ এ ধরণের সরলতা তার আছে, তার নিজস্ব সত্যপালন নীতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে। একটু খাপছাড়া তার স্বভাব, কিন্তু আগোছাল নয়, চোদ্দ পনের বছরেই তার চপলতা উপে গেছে, কিন্তু কোনো ভারেই তাকে ভারাক্রান্তা মনে হয় না। শান্ত রেশালো নৃত্যছন্দের গতিতে তার চলাফেরা নড়াচড়ার অন্ত নেই, মুখে মৃদু একটু হাসির সঙ্গে মিষ্টি সুরে সব কথাতেই কথা বলে যায়।

এখন, মোটে সতের বছর বয়সে যৌবনকে নিয়ে কি করতে হয় সে যেন জানে, দেহ যতই উথলে উঠুক মনে নির্মল স্বচ্ছ রসের মতো জীবনের উত্তাপ শুধু আস্তে আস্তে ফোটে। ছাতের শান্ত জ্যোৎস্নায় একা সে আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়, মনে হয় জন্ম থেকে বড়লোকের আদুরে মেয়ের মতো সে ভগবানের আদুরে মেয়ে হয়ে আছে, কোনো অভাব তার নেই, কোনো ভাবনা নেই। আবেগ অদম্য হলে হাঁটু পেতে বসে হাতে মাথা ঠেকিয়ে সে অনেকক্ষণ ভগবানকে প্রণাম করে, ভক্তি আর ভালোবাসার কত মানুষ যে বিরাট মহান রূপ নিয়ে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়, —তার দাদার একবছরের শিশুটি পর্যন্ত আকাশ পাতাল জুড়ে কোমল চামড়ার দ্যুতিতে চারিদিক নীলাভ করে তোলে, দুটি দাঁতের ফোকলা মুখে তার দিকে চেয়ে শুধু হাসে।

এই অবস্থায় বাড়ির লোকে তাকে মাঝে মাঝে আবিষ্কার করে। ডাকলেই সে ধীরে ধীরে উঠে বসে বলে, 'মাগো, কি প্রকাণ্ড একটা আগুন আকাশ দিয়ে চলে গেল।'

মা আর মায়ের সম্পর্কিতা মাসি বলেন, 'আইবুড়ো মেয়ে, এসময় তোর ছাতে উঠবার দরকার!'

দাদা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ওটা হল ধূমকেতু। শূন্য থেকে পৃথিবীর বাতাসে এলে জ্বলে উঠে। ওসব দেখে ভয় পাসনি মিণু।'

'ভয় পাব কেন?'

যতীন শোবার ঘরে গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল, প্রায় নিঃশব্দে বলল, 'বোস মিণু।'

বসবার চেয়ারটাও সে দেখিয়ে দিল, পাঁচ সাত হাত তফাতে। মৃগনয়না হেসে তার চেয়ারের হাতলে বসে বললে, 'তোমার যে কি এক বাতিক। আগে দূরে চেয়ারে বসে নানা ছলে একটু একটু করে কাছে

আসতে হবে। আজ আমার অত সময় নেই, মুখের ভাত ফেলে এসেছি।'
'তোমার নাকি আজ ফিট হয়েছিল?'
'কে বল্‌লে? ছাতে একা একা ভগবানকে প্রণাম করছিলাম, সবাই ভাবল কি যেন হয়েছে। বৌদি ডাকতেই উঠে বসলাম, ফাজলামি করে বললাম, আকাশে একটা আগুনের গোলা দেখে ভয় পেয়েছি। আসলে কি দেখেছিলাম জানো?' বিস্ময়ে দুচোখ বিস্ফারিত করে চিন্তার চাপে ভুরু কুঁচকে বল্‌লে, 'কি দেখেছিলাম? কিছুই তো দেখিনি।'
যতীনের কাঁধে হাতের ভর দিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, 'দেখিনি তো দেখিনি। বয়ে গেল।'
যতীন অনুভব করল, সে কাঁপছে। সমতল পথে খুব স্পীডে চালালে তার গাড়িটা যেমন কাঁপে।
যতীন স্বাভাবিক গলায় বল্‌লে, 'যাকগে ওসব বাজে কথা। এমনি ভাবে ঘুরিয়ে কাঁধে মাথা রাখো। তারপর মিন মিন করে সেই গানটা শোনাও তো। তুমি গাইবে আর আমি শুনব, আর কেউ না। বড় ভালোমেয়ে তুমি মিগু, বড় ভালো মেয়ে।'

বাড়ি ফিরে মৃগনয়না সবে ভাত খেয়ে ওপরে তার ঘরে গেছে, ঝড়ের বেগে বিশু এসে হাজির। এবাড়িতে তার ছেলেবেলা থেকে যাতায়াত, মৃগনয়নার সঙ্গে অনেক দিনের ভাব। এখন সে এম-এ পড়ে ও মৃগনয়নাকে পড়ায়। কি করে যে এ বন্দোবস্তটা স্থির হল বাড়ির লোকেরা কেউ খেয়ালও করেনি। মৃগনয়নার জন্য একজন মাস্টার রাখার প্রশ্ন উঠেছিল। একদিন দেখা গেল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে।
বিশু ব্যগ্রকণ্ঠে মৃগনয়নার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে?'
মা বললেন, 'ভালো আছে। তেমন কিছু হয়নি। এই তো ভাত খেয়ে ওপরে গেল।'

বিশু যখন ওপরে গেল, মৃগনয়না ঘরের দরজার ভারি পর্দাটা দুপাশে ভালো করে টেনে দিচ্ছে। বিশুকে ধরে ভেতরে ঠেলে দিয়ে পর্দাটা ঠিক করে সে মুখ ফেরাল।

'এত রাতে সবার শেষে উনি খবর নিতে এলেন। কী দরদ!'

'আমি কি জানতাম? এইমাত্র খবর পেলাম।'

'অন্য সবাই খবর পেল কি করে? খবর যে রাখতে চায়,খবর তার জোটে।'
বিশু বিব্রত হয়ে বলল, 'তোমাকে শোনাবার জন্য বাঁশি বাজাচ্ছিলাম। মনে হল ছাতে তুমিই ঘুরছ, তাই একটু বাজালাম। শোন নি?'
মৃগনয়না চুপ করে একটু ভাবল। তারপর হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো! তোমার বাঁশি শুনতে শুনতেই ভগবানকে প্রণাম করলাম। এমন করে বাজাও তুমি, এমন অস্থির অস্থির করে আমার!'
বিশু মুখভার করে বলল, 'ও, তামাশা হচ্ছে!'
মৃগনয়না বিস্মিত হয়ে বলল, 'ক্ষেপেছ নাকি? তামাসা নয়—সত্যি সত্যি সত্যি।'

মৃগনয়না চট করে পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দুহাত সামনে তুলে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তেমনি ভাবে হাত তুলে দাঁড়িয়ে বিশুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। কলহই হোক বা কথাকাটাকাটিই হোক, এই হল তাদের সন্ধিস্থাপনের বহুকালের পুরানো রীতি। মৃগনয়না হিস্ করামাত্র দুজনে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে পরস্পরকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ফেলল। একটি চুম্বনও এই রীতির অন্তর্গত। কোন রকমে সেটা শেষ করেই মৃগনয়না বিছানায় বসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি একটা অসভ্য, গুণ্ডা, বিশু।'
শুনে বিশু একেবারে নিভে গিয়ে বলল, 'কেন? আমি কি করেছি?'
'কি করেছ, তাও বলে দিতে হবে। তুমি এখনও পুরুষ মানুষ হওনি বিশু। কত জোরে ধাক্কা দিয়েছ জানো। কি রকম লেগেছে জানো?'

'সত্যি লেগেছে ?' মৃগনয়নার সামনে হাঁটু পেতে বসে বিবর্ণ মুখে বিশু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন মৃগনয়নার মুখে দেখা গেল হাসি। বিশুর মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিয়ে তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সে মিষ্টি সুরে বলল, 'সত্যি লেগেছে। তোমার দোষ নেই, তুমি তো কিছু জানো না। তুমি আমাকে ভালোবাসতে শিখেছ, আর এইটুকু শেখনি যে ছুটে এসে আমাকে তোমার ধাক্কা দিতে নেই ? আমি ছুটে যাব, তুমি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমায় ধরে ফেলবে। ষাঁড়ের মতো গুঁতো দিলে মেয়েদের লাগে না ?'

বিশু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'আমারও তো লেগেছে।'

'পুরুষ ছেলে লাগত না।'

পাঁচ মিনিট পরে দুজনের জোরালো হাসি কানে যেতে মা হাঁক দিয়ে বললেন, 'ও বাবা বিশু, রাত যে অনেক হয়ে গেল বাবা।'

যাওয়ার আগে বিশু বলল, 'সেখানে যাবে ?'

'না। আজ বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

বিশু বাড়ি পৌঁছবার আগেই মৃগনয়না ঘুমিয়ে পড়ল। মা এসে মশারি ফেলে আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েকে তিনি বুঝতে পারেন না, পেটের মেয়েকে! মেয়ে তার ভক্তিমতী। কিন্তু মায়ের মতো মন্দিরে গিয়ে কোনো দিন প্রণাম করে না, দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত বাপের সঙ্গে উপাসনায় বসত, এখন তাও বসে না। ছাতে গিয়ে একা ভগবানকে প্রণাম করে। আকাশে জলন্ত আগুনের গোলা ছুটে যেতে দেখতে পায়। চলাফেরা কথাবার্তায় কিছুই ধরা যায় না। কোমল মন তার এমন মিষ্টি স্বভাব, কোন ঘরে সে যাবে ভেবে বুকটা তার ধুকপুক করে। তবু মেয়েটাকে তিনি বুঝতে পারেন না। পেটের সন্তানকে যেন ভিন্ন মনে হয়।

মৃগনয়নার স্তন্যপানের ধরণটা পর্যন্ত যে তার মনে আছে! সে কেন পর হয়ে না গিয়েও অজানা হয়ে গেল!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন, কি করে অনুমান করে তাঁর স্বামী তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এঘরে তিনি একলা থাকেন, যখন ইচ্ছা ঘরে যাবার অনুমতি স্ত্রীর আছে। কিন্তু যিনি সর্বদাই আত্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকেন অথবা বই পড়েন, তার কাছে বেশি যাবার ইচ্ছা লোকের হয় না। ঘরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে এক হাতে জড়িয়ে তাকে আরও কাছে টেনে নিলেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার অবজ্ঞায় তুমি কাঁদছ বড় বৌ? তুমি তো ইচ্ছে করলেই আসতে পার, যখন খুশি আসতে পার!'

মৃগুর মা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'সেজন্য নয়।'

মৃগুর বাবার মুখখানা একটু ম্লান হয়ে গেল, জড়ানো হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে এল।

'মেয়ের জন্য বড্ড ব্যাকুল হয়েছে মনটা।'

মৃগুর বাবা সহসা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, 'মিগুর জন্য? কেন, কি হয়েছে?'

রাত দুটো পর্যন্ত সেদিন তাঁদের কথা চলল।

ইতিমধ্যেই একটি সুপাত্র পাওয়া গেল। শিক্ষিত, সুশ্রী, বড়লোকের ভালো ছেলে। একটা দিনও স্থির হয়ে গেল, যেদিন পাত্র এসে মৃগনয়নাকে দেখে শুনে পছন্দ করে যাবে। না, ঠিক প্রাচীন যুগের মেয়ে দেখার অসভ্যতা তারা করবে না। বাড়িতে দুতিনটি ভদ্রলোক পরিচয় করতে এসেছেন এমনি সাধারণভাবে আগমন ও এবিষয়ে ওবিষয়ে অল্প আলোচনা হবে। বিয়ের পরেও মৃগনয়না যতদূর খুশি পড়তে পাবে। সত্য কথা বলতে কি, পাত্র নিজেই তা চায়।

মৃগনয়না বাবার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলল, 'আমি যাকে-তাকে বিয়ে করতে পারব না বাবা।'

'কেন, ছেলেটি তো সবদিক দিয়ে ভালো?' পরক্ষণে নিজের ভুল সংশোধন করে বললেন, 'ও! যাকে-তাকে বিয়ে করতে পারবে না বলছ। বেশ, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার বিয়ের আয়োজন হচ্ছে শুনেও তো কেউ এল না আমার কাছে।'

'আজকালের মধ্যেই আসবে বাবা।'

'বেশ। কিন্তু যাদের ডাকা হয়েছে তাদের একটু অভ্যর্থনা করবে না মিণ্ড?'

'করব বৈকি। ভদ্রলোক হলে নিশ্চয় করব।'

মৃগনয়না অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে নেমে গেল। বিয়ে না করলেও তার চলে—পারিবারিক শক্তির সমবেত আক্রমণ প্রতিরোধ করার হাঙ্গামাটা শুধু তার পোয়াতে হবে। হাঙ্গামা যখন করতেই হবে, বিশেষ একজনকে বিয়ে করার জন্য হাঙ্গামাটা ঘটতে দিতে দোষ কি? যতীন অথবা বিশুকে বিয়ে করা সহজ, দ্বিতীয়পক্ষ হলেও বিশু ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেন্ট। কিন্তু ওদের দুজনকে তার পার্টিতে সমর্পণ করার কথা, নিকগে পার্টি ওদের। হাবুলকে হলেই তার চলবে। পার্টি আপত্তি করবে না, হাবুল আগে থেকেই পার্টির মেম্বার। দুজনে মিলে তারা কাজ করতে পারবে। বাড়িতে কেবল হুলস্থুল পড়ে যাবে হাবুলকে সে বিয়ে করতে চায় শুনে! বাবাও সহজে মত দেবেন না! কিন্তু সেজন্য মৃগনয়নার বিশেষ ভাবনা নেই। বাড়িতে একটা প্রচণ্ড ঝড় তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত হাবুলকে সে বিয়ে করতে পারবে।

হাবুল ছাড়া আর কাউকে বিয়েও করা যায় না। অত তেজ, অত আগুন কার মধ্যে আছে? যতীন আর বিশু দুজনেই বড় বেশি ভালোমানুষ আর ছেলেমানুষ!

ওদের মনে ব্যথা লাগবে। পার্টির কাজে জীবন উৎসর্গ করেও হয়তো ব্যথাটা সম্পূর্ণ উবে যাবে না। মৃগনয়না ওদের জন্য যতদূর সম্ভব করবে। সর্বদা তাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার সুযোগ ওরা পাবে।

সন্ধ্যার পর পার্টির পাঁচজন প্রধানদের মধ্যে চারজনের কাছে মৃগনয়না তার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করল। মিসেস বসাককে আজ বিশেষ করে আনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েদের তিনি বোধ্য বিষয় চমৎকার বুঝিয়ে দিতে পারেন। সেক্রেটারি ধরণীবাবুর মুখ প্রতিদিনের মতো একান্ত নির্বিকার, কালা ও বোবা মানুষের মতো তাঁকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র মনে হয়। কিন্তু কথা যখন তিনি বলেন, মনে হয় একজন পরমাত্মীয় এতক্ষণ ছদ্মবেশ ধরে ছিলেন। ধীরেন বড়লোকের ছেলে, কলেজে পড়ে এবং একজন ষ্টুডেন্ট-লীডার, পার্টির কোন মেয়েকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। রহমন প্রপাগাণ্ডা সেক্রেটারি। নরেশ আগে চুপচাপ মানুষ ছিল, পার্টির একটি সমবয়সী মেয়েকে বিয়ে করার পর আজকাল বড় বেশি কথা কয়।

মৃগনয়নার কথা শুনে সে উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'বিয়ে করবে ? কনগ্র্যাচুলেশান্‌স্ ! বিয়ের সাধটা শেষ পর্যন্ত উপে যাবে ভেবে রীতিমত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম ভাই। যে কাজের ভারটাই নিয়েছ !'

মিসেস বসাক বললেন, 'আঃ, আপনি চুপ করুন। কিন্তু মৃগনয়না, তোমার কাছে যে আরও অনেক কিছু পার্টি আশা করছে! আরও কয়েক বছর তুমি আরও কয়েকজনকে পার্টিতে আনতে পারবে, এখনো তোমার সরলতা, সহজ ছেলেমানুষী ভাব আরও কয়েক বছর থাকবে। তুমি বলেছিলে পার্টির জন্য জীবন দেবে। এত শীগগির একজনকে হৃদয় দান করে ফেলা তোমার উচিত হয়নি। সাধারণ বাজে মেয়েরা এরকম করে, পার্টির চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ তাদের বড় হয়ে দাঁড়ায়। তুমি তাদের মতো নও। যতীনবাবুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা

কোনো মেয়ে জোগাড় করতে পারেনি, তুমি তাকে পার্টির মেম্বার করেছ, তাঁকে দিয়ে প্রেস কিনিয়ে দিয়েছ। বিশুকে তুমি পার্টিতে এনেছ, কয়েক বছর ট্রেনিং পেলে ও দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেবে—বিশেষত, তোমাকে পেলে পার্টির জন্ত ও করবে না এমন কাজ নেই। তোমার মতো ওয়ার্কার পার্টিতে একজনও নেই। বিয়ের বয়স তোমার ফুরিয়ে যাচ্ছে না, ক'টা বছর একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারনা?'

ধরণীবাবু বললেন, 'তাছাড়া, আমরা ভাবছিলাম সামনের বছর তোমাকে কমিটিতে নেওয়া হবে। এখন পার্টি ছেড়ে যাওয়া—'

মৃগনয়না মৃদুস্বরে বললে, 'পার্টি ছাড়ব কেন? আমি একজন পার্টির লোককে বিয়ে করছি—দুজনে আমরা পার্টির কাজ করব।'

মিসেস বসাক সভয়ে বললেন, 'যতীনবাবুকে? না বিশুকে? দফা সেরেছ তুমি। যাকে তুমি বিয়ে করবে, তাকেই পার্টি হারাবে। শুধু নামটা হয়তো লেখা থাকবে খাতায়।'

'আমি হাবুলমামাকে—মানে, প্রশান্ত দত্তকে বিয়ে করব।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নরেশ প্রশ্ন করল, 'হাবুলমামা বলছ—?'

'না, সম্পর্ক কিছু নেই। যাকে দিদি বলেন, তাই হাবুলমামা বলি। ওঁর মনের জোরের তুলনা হয় না। সারাদিন খেটে সকলকে খাটান, তারপর এতটুকু বিশ্রাম না করে পার্টির কাজ করেন। অমন স্বাস্থ্য তাই, অন্তলোক হলে মরে যেত।'

মিসেস বসাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা, বিয়ে যদি করতে চাও, বাধা দেবার অধিকার আমাদের নেই। শুধু ভাবছি, বিয়ের পর যতীনবাবু, বিশু এদের মতো কাউকে কি পার্টিতে আনতে পারবে।'

মৃগনয়না চুপ করে রইল। ঘরের স্তব্ধতায় তার বক্তব্য যেন মুখর হয়ে রইল তার শব্দহীন কথায়, পার্টির জন্ত সে প্রাণ দেবে কিন্তু তার চুম্বক

ধর্মকে আর কাজে লাগাতে পারবে না। দুজনকে টানতেই তার হাঁফ ধরে গেছে।
মৃগনয়না খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল। হাবুল সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে সবে স্নান শেষ করেছে, মৃগনয়না তাকে গ্রেপ্তার করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। সব শুনে কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল মৃগনয়নার হাবুলমামা!
'আমি তোমাকে বিয়ে করব? পাগল নাকি! আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বড়লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা—'
'বড়লোকদের বিরুদ্ধে নয়।'
'ওসব কূটতর্ক রাখ। গরীবের মেয়ে হলেও তোমাকে আমি বিয়ে করতাম না মিণ্ড। বিয়ে যদি কোনোদিন করি, পার্টির কোনো খাঁটি ওয়ার্কারকে করব, যাতে দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে পারি।'
মৃগনয়না বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে প্রশ্ন করল, 'আমি কাজ করি না?'
'তুমি?' হাবুলের চোখে মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি দেখা গেল, 'তুমি পার্টির যতীনবাবুদের মোটরে ঘুরে বেড়াও, হোটেলে খানা খাও, বিশুর সঙ্গে সিনেমায় যাও—পার্টির কাজ কর বৈকি!'



ঈষৎ ঢাল সমভূমিতে এলোমেলো ভাবে ছড়ান বাড়িগুলি শেষ দুপুরের রোদ পোয়াচ্ছে। শীতকালের খাঁখাঁ টনটনে পাহাড়ী রোদ। পশ্চিমে সরু একফালি সাফসুরুৎ অরণ্যের এক মাথায় টিলার মতো ছোট পাহাড়টি বসান। দুদিকে শাখাপ্রশাখা ছড়াতে ছড়াতে এসে প্রধান রাস্তাটি পাহাড়ের প্রায় দেড়শ গজ তফাৎ দিয়ে এগিয়ে গেছে। পথ আর পাহাড়ের মধ্যে বাড়ি আছে তিনটি। দুটি বাড়ির গেট প্রায় পথের উপরে, অন্য বাড়িটি পাহাড়ের ঠিক নিচে। পথ-ঘেঁষা বাড়ি দুটির ব্যবধানকে মাঝামাঝি চিরে মাটি পাথর আর শুকনো পাতার এবড়োখেবড়ো পথ পাহাড়-ঘেঁষা বাড়িটির সঙ্গে বড় রাস্তার সংযোগ ঘটিয়েছে।

বাড়িটি ছোট এবং সাদাসিদে। একসারিতে পাশাপাশি তিনখানা ঘর, সামনের সমস্তটাই খোলা বারান্দা। বাড়ির আনুসঙ্গিকটি অনেকখানি

তফাতে চাকা-বসান ক্ষুরোর ধারের বিচ্ছিন্নতায় এবং আগাগোড়া টিনের হওয়ার তুচ্ছতায় প্রায় চোখেই পড়ে না।

বারান্দার একধারে সাধারণ ছুটি বেতের চেয়ারে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক রোদে বসেছিল। পুরুষটি মাঝবয়সী, সুস্থ সবল উন্নত চেহারা, ছোট্ট চিবুক কামানো দাড়িতে কড়া দেখায়। তার স্ত্রী হবার মানানসই বয়স মেয়েটির, যদিও সে ক্ষীণাঙ্গী। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে দুজনেরি ঠোঁট ফেটেছে, মেয়েটির পাতলা ঠোঁটের ছুটি ফাটলে রক্ত জমে আছে দুইরত্তি। উদ্বিগ্ন প্রত্যাশায় দুজনকেই একটু উতলা মনে হচ্ছে। পথের দিকে তাকাবার ভঙ্গিতে এবং বড় রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ হলে দুজনের নড়েচড়ে বসবার রকমে প্রত্যাশার স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'সময় চলে গেছে। আজ আর আসবে না।' ঠোঁট বাঁচিয়ে প্রমীলার কথা বলার চেষ্টা দেখে পরাশর নিজেও ঠোঁট বাঁচিয়েই একটু হাসল।

'গাড়ি আজকাল তিন চার ঘণ্টাও লেট করছে। তবে না-ও আসতে পারে, চিঠি লেখার পর হয়তো মত বদলেছে। ধাপ্পাও হতে পারে।'

প্রমীলা মাথা নাড়ল। 'এতকাল পরে হঠাৎ ধাপ্পা দিতে যাবে কেন?'

'কেন? কে জানে কেন! এতকাল পরে হঠাৎ দেখা করতেই বা আসবে কেন? এমন খাপছাড়া কাজ কেউ করে বলে তো শুনি নি।'

তিনবার কথা বলতে গিয়ে প্রমীলা চেপে গেল। তারপর আচমকা বলে ফেলল, 'আমাকে হয়তো একবার দেখতে চায়।'

'তোমাকে? পাঁচ ছ বছর চুপ করে থেকে হঠাৎ স্ত্রীর জন্য ভূপতির মাথাব্যথা হবে কেন?'

'মনস্তত্ত্ববিদ!' বলে প্রমীলা হাসল এবং 'উঃ' শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। পরাশরের পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাতের ভর দিয়ে মাথায় গাল রেখে মৃদুস্বরে বলল, 'মন বুঝেও মান রেখে কথা কইতে তুমি আর শিখলে না। আমি জানি তুমি কী ভাবছ—টাকা বাগাবার চেষ্টায় আসছে।'

'ভাবি নি ঠিক, ওই রকম কিছু আন্দাজ করছিলাম। তবে একটা খটকা লাগছে, এতদিন চুপ করে রইল কেন?'

'সাহস পায় নি হয়তো। তুমি যে স্পষ্ট বলে দিলে একটু গোলমাল করলেই খুন করে ফাঁসি যাবে। মেয়েমানুষ নিয়ে জগতে ঢের খুনটুন হয়ে গেছে জানে তো। তোমাকেও জানে ছেলেবেলা থেকে, কী রকম মাথা খারাপ তোমার। তারপর মানুষটা যা ভীরু। তুমি যে শুধু ভয় দেখিয়ে—'

'ভয় দেখাই নি। এসে যদি গোলমাল করে সত্যি খুন করব।'

'না। সত্যি বলছি ভালো হবে না যদি মাথা গরম কর। দরকার হলে মারধোর করে তাড়িয়ে দাও, সে আলাদা কথা। ওর জন্যে তুমি বিপদে পড়বে, মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

প্রমীলা ফিরে এসে চেয়ারে বসল। শুকনো বাতাস দুজনেরি মুখের তৈলাক্ত লাবণ্য শুষে নিয়েছে, পরিবর্তনহীন স্থায়িত্বের মধ্যে এই মৃদু রুক্ষতার কারণটা অতিশয় প্রত্যক্ষ। মুখ দেখে দুজনের দুর্ভাবনার ঠিক মতো হদিস পাওয়া কঠিন। মনের আলোড়ন আড়াল করে রেখে সহজ হয়ে থাকবার চেষ্টাই বরং প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ছে। দুচোখে প্রশ্ন নিয়ে একজন আরেকজনকে নিরীক্ষণ করছে, অপরের মধ্যে শুধু ভাবনা অথবা ভয় জানবার ইচ্ছায়।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে পরাশর বলল, 'টাকার জন্য নাও হতে পারে, মিনু।'

'কী তবে?' প্রমীলাও দেখাদেখি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে লাগল।

'কোন রকম প্রতিশোধ নিতে হয়তো আসছে।'

'প্রতিশোধ নেবে? ও?' ঈষৎ বিবর্ণ মুখখানা প্রমীলার আন্তরিক অবজ্ঞা ও ঘৃণায় কালচে মেরে গেল, 'যে মানুষ অন্যায় সয়ে চুপ করে থাকে—' প্রমীলা ঢোক গিলল, 'আমরা যে অন্যায় করেছি তা বলছি না, তবু—'

কথা বলার সুযোগ আর তারা পেল না। দেখা গেল, চুনীলালের ভাড়াখাটা গাড়িটি সর্বাঙ্গে আওয়াজ তুলে মাটি পাথর আর শুকনো পাতা দলন করে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে।

গাড়ি থেকে নামল একটা কঙ্কাল।

পরাশর ও প্রমীলা দুজনেই চমকে গেল ভূপতিকে দেখে। মুখে হাড়ের ওপর যেন আলগা করে চামড়া বসান আছে, শুকনো রঙচটা বাদুড়ের পাখার মতো পাতলা চামড়া। চোখ কোটরে, মাথায় বেশির ভাগ চুল উঠে গেছে, গলা এমন সরু যে প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয় মাথার ভারে মট করে মচকে যাবে। হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি যেন লম্বায় বেড়ে তেরচা হয়ে গেছে। গা উদলা থাকলে হয়তো তাকে এতবেশি জীবন্ত কঙ্কাল বলে মনে হত না। যে টুকু বাইরে আছে তার বীভৎস শীর্ণতাই যেন ঘোষণা করছে গরম জামা কাপড়ের আড়ালে শুধু আছে শ্যাওলা-ধরা ময়লা হাড়।

নামতে ভূপতির কষ্ট দেখে বোধ হয় তাকে সাহায্য করার প্রেরণাতেই প্রমীলা সিঁড়িতে একধাপ নেমে থমকে দাঁড়িয়েছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে সে ভূপতিকে দেখতে লাগল। ভূপতি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, দেহটাই তার বাঁকা হয়ে গেছে। হাত পা নাড়তে তার সময় লাগে। ধীরে ধীরে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে চুনীলালের ভাড়া মিটিয়ে দেবার সমস্ত সময়টা সে থর থর করে কাঁপতে লাগল। পা টেনে টেনে সিঁড়ির নিচে এসে মৃত চোখের অসহায় দৃষ্টিতে সে দুজনের দিকে তাকাতে লাগল। পরাশর চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি, দু হাতে চেয়ারের দু প্রান্ত সজোরে চেপে ধরে মেরুদণ্ড টান করে বসে আছে। মনে হল, প্রমীলাকে ধরে বুঝি ভূপতি বারান্দায় উঠবার চেষ্টা করবে। খানিক ইতস্তত করে সে সামনে ঝুঁকে দু হাত সিঁড়িতে রাখল,

তারপর শ্লথ মন্থর চতুষ্পদের মতো তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল কোঁকাতে কোঁকাতে। প্রমীলার চেয়ারে বসে পেছনে হেলান দিয়ে সে চোখ বুজল।

প্রমীলা চোখ বুলোতে লাগল কদম, পেয়ারা, ইউক্যালিপটাস গাছগুলিতে। ল্যাজঝোলা চপল কাঠবেরালিটাকে প্রাণপণে দেখে, ঘন ঘন পলক ফেলে, চোখ বুজে সে যেন দৃষ্টিজোড়া অবান্তর, অপার্থিব, অসম্ভব দৃশ্যটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল ভুল বা স্বপ্নের মতো।

'তোমার কী হয়েছে?' পরাশর শুধোল। মৃদুস্বরে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতেই তার গলাটা গেল কেঁপে।

'টি-বি।' ভূপতি চোখ মেলল না।

'এখানে এলে কেন তুমি?'

'মরতে।'

'এ অবস্থায় এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি।'

'উচিত হয় নি মানে? পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আমি মরে যাব।'

ভূপতির গলার আওয়াজ মাঞ্জা দেওয়া সরু তারের মতো ধারাল, বড় মানানসই তাই শোনাল তার কথাগুলি। প্রমীলার কপালের ঠিক মাঝখানে, মেয়েরা যেখানে টিপ পরে, শির শির করতে লাগল আর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ক্ষণস্থায়ী তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতি লোমকূপে ছুঁচ বিঁধল একটা করে।

তারপর পরাশর ও প্রমীলার মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। পরাশর কী বুঝল, কী ভাবল সে-ই জানে, মুখের শূন্যতাকে বার কয়েক চিবিয়ে নিয়ে সে রূঢ়কণ্ঠে বলল, 'তুমি কি আর মরবার জায়গা পেলে না?'

'না।'

'এখানে তোমায় আমরা রাখতে পারব না।'

'পারবে।'

'গায়ের জোরে নাকি তোমার ?'

'জোর কই গায়ে ?'.

'তোমার মতলব জানি, তুমি প্রতিশোধ নিতে এসেছ। ভেবেছ, মরতেই যখন হবে, ওদের ওখানে গিয়ে মরি, দু জনের শান্তি নষ্ট হঁয়ে যাবে। সিনেমার গল্প ঘেঁটে ঘেঁটে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে ভূপতি। এ রকম উদ্ভট নাটুকেপনা করে তাই মরতে এসেছ প্রতিশোধ নিতে।'

'চার বছর সিনেমা ছেড়েছি ভাই, অসুখে ভুগছি। কিসের প্রতিশোধ ?'

'বাজে বোকো না ভূপতি।'

'বাজে বকতে সত্যি কষ্ট হয়।'

'এসেছ, আজ রাতটা থাকো। কাল সকালে নিজে থেকে যদি না যাও, তোমায় হাসপাতালে ফেলে রেখে আসব। জিদ্ করে মদ খাওয়াতে গিয়ে আমি বৌয়ের দাঁত ভেঙে ফেলি না, কিন্তু আমিও নিষ্ঠুর হতে জানি।'

'এমনিতেই পাঁচ সাত দিন মোটে টিঁকব। জোর করে তাড়াতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে।'

পরাশর হার মেনে চুপ করল। কতদিন থেকে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ভূপতির কাছে ভয়-ডর দ্বিধা-সংকোচ লজ্জা-মান সব কিছু বাতিল হয়ে গেছে কে জানে! শিশু আর মুমূর্ষুর সঙ্গে কে লড়াই করবে? এতক্ষণে পরাশরের নজরে পড়ল, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে প্রমীলা তাকে নিষেধ করছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে প্রমীলার।

ভূপতি আবার চোখ বন্ধ করল। অস্ফুটস্বরে বলল, 'একজন ডাক্তার ডাকাও। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকাও একজন। আমায় বিছানায় শুইয়ে দাও। কটা দিন বাঁচিয়ে রাখ। মরতে দিও না।'

ব্যাকুলতায় পাগলের মতো হয়ে প্রমীলা বলল, 'শিগ্গির যাও, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। কী করি এখন আমি!'

তারপর ডাক্তার এল, ওষুধ এল, পথ্য এল, রচিত হল মুমূর্ষুর রোগশয্যা। ভূপতি মরবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনো যখন মরেনি তাকে বাঁচাবার সমস্ত চেষ্টাই করতে হবে বৈকি। চার বছরের চেষ্টায় কোনো ফল হয় নি তাও সত্য, কিন্তু ভূপতি শেষ হয়ে যাবার আগে তো চেষ্টা শেষ হতে পারে না। হাড়কাঁপানো পাহাড়ী শীতে অনেক রাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে পরাশর যে চিকিৎসার আয়োজন করে ফেলল তাতে আর খুঁত রইল না। র‍্যাপার-কম্বল জড়িয়ে রোগীর শিয়রে বসে দুজনে রাত কাটিয়ে দিল।

রাতভোর দুজনেই যে কতবার সন্তর্পণে পরীক্ষা করে দেখল ভূপতির দেহে প্রাণ আছে কি না!

ঘুমে অথবা অবসাদে সারারাত ভূপতি মড়ার মতো পড়ে রইল। প্রথম সে চোখ মেলে চাইল অনেক বেলায়, ভাঙ্গা গলায় ফিসফিস আওয়াজে প্রথম কথা কইল, 'আমি মরি নি?'

ডাক্তার পরামর্শ দিলেন যে এসব রোগের চিকিৎসা এসব রোগের চিকিৎসাকেন্দ্রেই ভালো হয়। আশা যদিও নেই বিশেষ কিছু, তবু ভূপতিকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

প্রমীলা তাকিয়ে রইল পরাশরের মুখের দিকে।

পরাশর বলল, 'থাকগে, কাজ নেই। আমরাই যতটা পারি করি।'

পাঁচদিন গেল, সাতদিনও গেল। ভূপতি মরল না। চেঞ্জ, নতুন ডাক্তারের চিকিৎসা, পথ্যের অদল-বদল, সেবা-যত্নের নতুনত্ব, মানসিক পরিবর্তন কিসে যে কি হল কেউ জানে না, তিন সাতে একুশ দিন পরেও ভূপতি বেঁচে রইল। ডাক্তার, স্পেশালিষ্ট নন বলে এখানে রেখে ভূপতির চিকিৎসা করতে যিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তিনি গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে জানিয়ে দিতে লাগলেন দিন দিন ভূপতির অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

জানিয়ে দেবার অবশ্য কোনো প্রয়োজন ছিল না, পরাশর ও প্রমীলার চোখেও সে উন্নতি ধরা পড়ছিল।

একদিন পরাশর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর সত্যি টি-বি হয়েছিল তো ডাক্তারবাবু? না, খেতে না-পেয়ে ওরকম হয়েছিল?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন। বললেন, 'সে কি! তাই কখনো হয়? আমি টি-বির চিকিৎসা করছি—'



যে বাঁচায়

দশ বছর পরে মাধব দেশের গাঁয়ে ফিরল। রিলিফ ওয়ার্ক চালাবার জন্ত। গাঁয়ের নাম্ বাঙ্গাতলা। গাঁয়ের গৌরব ধনঞ্জয় সরকার। কলকাতায় ব্যবসা করে বড়লোক হয়ে তিনি বাঙ্গাতলাকে ধন্ত করেছেন। প্রতি-বছর তিনি একবার গাঁয়ে আসেন, সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে এবং একদিনের জন্ত। বাঙ্গাতলা ও আশেপাশের আরও কয়েকটা গাঁয়ের লোক তাঁকে অজস্র সম্মান দেয়। ছুচারশো টাকা দান করে তিনি ফিরে যান। সম্মানের বিনিময়ে নয়, এমনি। সম্মান তাঁর পাওনাই আছে। বাঙ্গাতলায় যে অবৈতনিক বিদ্যা, দাতব্য চিকিৎসা, টিউব ওয়েলের জল ইত্যাদি পাওয়া যায় সে সব সরকার মশায়েরই কীর্তি। তাঁরই আপিসে মাধব চাকরি করে। নির্ভরযোগ্য হাসিখুশি ভালোমানুষ, গুছিয়ে কাজ করতে পারে এবং কাজ করিয়ে নিতে জানে। আদর্শবাদী অথচ বেশ হিসেবী। প্রচুর বিনয় ও ট্যাক্ট আছে। মাঝে মাঝে বই

পড়ায় সখ চাপে, আবার কেটে যায়। স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসে। ছেলেটিকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে আদর করে অবর্ণনীয় সুখ পায়। ধনঞ্জয় তাকে পছন্দ করেন এবং দেড়শো টাকা মাইনে দেন।

বাঙ্গাতলায় লোকে না খেয়ে মরছে শুনে ধনঞ্জয়ের ভাবনা হয়েছিল। গাঁয়ের লোকের ভালোমন্দের দায়িত্ব তো তাঁর। গাঁয়ের একত্রিশ জনকে তিনি সম্প্রতি আপিসে কাজ দিয়েছেন। ধনঞ্জয় নিজেই যে ফাঁপছিলেন তা নয়, তাঁর জানাশোনা আরও অনেকে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছিল। লোকের প্রয়োজনও বেড়েছিল সেই অনুপাতে—আপিসে, কারখানায় এবং মফস্বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা ওটা গড়ে তোলবার স্থানে। শুধু বাঙ্গাতলা নয়, আশেপাশের আরও কতগুলি গাঁয়ের হাজার খানেক লোককে কাজ দেবার সাধ ধনঞ্জয়ের ছিল। কোশপুরে মস্ত কাজ হচ্ছিল, সকলকে তিনি সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। সবাই খাওয়া পেত, থাকার ঘর পেত, মজুরি পেত—তিনটিই ভালো পেত। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রকাশ পাওয়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর নামে কুৎসা রটে গেল, তিনি নাকি কুলি চালানের দালালি নিয়েছেন। যত চাষী মজুর হতে রাজী ছিল তাদের একজনকেও তিনি তাই কাজ দেন নি। নিন্দেটা তাতে প্রমাণ হয়ে যেত! তারপর ধনঞ্জয় স্থির করেছেন বাঙ্গাতলায় দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ করবেন। না করে উপায়ও তাঁর ছিল না। নানা দিক থেকে চাপ পড়ছিল। তার মতো বড়লোক অনেকে বিতরণ করছে, এ একটা চাপ। কনট্রাক্ট দেবার কর্তারা ইঙ্গিত করছেন, সে আরেকটা চাপ। বাঙ্গাতলা হিতৈষিণী সমিতি (প্রেসিডেন্ট—ধনঞ্জয় সরকার) গাঁয়ের লোকের প্রত্যাশাকে আবেদন নিবেদনের রূপ দিচ্ছে, সেও চাপ। তাছাড়া পূর্বোক্ত কুৎসাটির প্রতিকার করার বাসনার চাপ এবং হৃদয় নামক অঙ্গটির দয়াদাক্ষিণ্য ও উদারতার চাপ তো আছেই।

কাজের ভারটা তিনি দিয়েছেন মাধবকে; সেই সঙ্গে দরকারী উপদেশও

দিয়েছেন। মাধবকে বেশি বলা বাহুল্য, কি ভাবে কি করতে হবে তার পলিসিটা বাৎলে দিলেই সে সব সমঝে নেয়। মাধবের নীতিজ্ঞান স্মৃতি তীক্ষ্ণ।

'একটু সামলে চোলো হে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কলকাতায় লোকারণ্য কেন? ফুটপাতে মানুষ মরতে আসছে কেন? কলকাতায় খাবার আছে। বেশি খেতে দিলে চাদ্দিকের লোক বাঙ্গাতলায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সামলাতে পারবে না। কি অবস্থা!'

'ছোট মগের মাপে দেব ভাবছি। বেশি সইতেও পারবে না, পেট খারাপ হয়ে যাবে।'

'অন্নই আসল জীবন। ব্যঞ্জন নয়, স্বাদগন্ধ নয়।'

'নিশ্চয়ই। ভিক্ষের চালের আবার কাঁড়া-আঁকাড়া।'

'এমন অবস্থা আর হয় নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোথা লাগে! ভালো কথা মাধব, অক্ষয়ের বোনটা নাকি নিখোঁজ হয়েছে?'

'নিখোঁজ মানে ওই আর কি যা হয় বুঝলেন না?'

'তা, দোষ কি করে দি? যুবতী মেয়ের খিদে একটু বেশিই হয়। আহা, এদিকে খিদের জ্বালা, ওদিকে বদ্‌লোকের প্রলোভন, যুবতী মেয়ে তো যতই হোক! গাঁয়ের কেউ ওকে দুটি খেতে দিতে পারল না? ভদ্র ঘরের বাড়ন্ত যুবতী মেয়ে, চাইতে পারে না বলে কি দিতে নেই? ছি ছি! এ গাঁয়ের কলঙ্ক, আমার কলঙ্ক। বিপাকে পড়লেও ভদ্রঘরে ভিক্ষে নেবে না। লুকিয়ে কিছু কিছু চাল ডাল ঘরে দিয়ে এলে ওদের মানটাও বাঁচে, প্রাণটাও বাঁচে।'

'তা দিতে হবে বৈকি!'

'আমার দোষ নেই। অক্ষয়ের বিধবা মা আর যুবতী বোনটা যে গাঁয়ে পড়ে আছে কেউ আমায় জানায় নি। তবু আমিই দোষী। জেল থেকে

বেরিয়ে অক্ষয় ভাববে কি না বলো যে সরকার মশায় থাকতে তার সর্বনাশ হল ?'

'তা ঠিক। দেখি কি করতে পারি।'

স্টেশনে ভিড় করেছিল একদল নরনারী যাদের দেখলেই মরণাপন্ন গাছের কথা মনে পড়ে যায়। মাধব তাদের জন্য কলকাতা থেকে চাল ডাল আটা ময়দা নিয়ে আসছে খবর শুনে তারা স্টেশনে ছুটে এসেছে। না, ঠিক ছুটে তারা আসে নি, ধীরে ধীরে হেঁটেই এসেছে। বাঙ্গাতলা থেকে স্টেশন মোটে তিন মাইল পথ, দশ পনের মাইল হলেও তারা আসত। কারণ, দান এগিয়ে গিয়ে সবার আগে নিতে হয়, নইলে ফুরিয়ে যায়। জগতে চিরকাল চাওয়ার তুলনায় দান কম পড়ে এসেছে, সবার আগে হাত পাতবার প্রয়োজনটা তাই সবাই জানে।

বেলা তিনটের গাড়ি পৌছল সন্ধ্যা সাতটায়। স্টেশনের গ্রাম্যতা তখন অন্ধকারের রূপ নিচ্ছে। লোক দেখে মাধব প্রথমে ভেবেছিল, সরকার মশায় আসবে শুনে সবাই বুঝি তাকে অভ্যর্থনা করতে এসে ভিড় জমিয়েছে, তারপর আসল ব্যাপার টের পেয়ে তার বেশ একটু উল্লাস ও গুরুত্ববোধ জাগল। কারণ যাই থাক, তারই প্রতীক্ষায় এতগুলি লোক জমা হয়েছে এ চিন্তা মানুষকে উল্লাস দেবেই, নয়তো কোনো চাপরাসী কোনোদিন খাতির পেয়ে খুশি হত না। গুরুত্ববোধ জাগল দায়িত্বের হদিস পেয়ে। এদের প্রত্যাশা যে কত অধীর এই ভিড় তার প্রমাণ। তাকে কারবার করতে হবে এদের নিয়েই।

মাধবের সঙ্গে শুধু বিছানা আর সুটকেস নামতে দেখে জনতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ্য উপলব্ধি করে মাধবের গা ছমছম করতে লাগল। খালি হাতে স্টেশনে নেমে সে যেন হৃদয় মনের এক বিরাট অভিযানকে বিপথে চালিয়ে দিয়েছে; পাক দিয়ে এসে সেটা রক্তমাংসের আক্রমণে পরিণত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

হেডমাষ্টার ভূপতি চক্রবর্তী বললেন, 'আপনি ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি বলেছিলাম, বিশ্বাস করে নি।'

মাধব কি আর করে, দুবার থুক্ থুক্ করে কেশে নিয়ে চিৎকার আরম্ভ করল : সকলে শোন—

সকলে শুনল। সেই ভয়ানক স্তব্ধতা ভেঙে গেল। উন্মুখ ভিক্ষুক বোধ হয় মরে গেলেও আশ্বাসের মন্ত্রে বেঁচে ওঠে। নয়তো পৃথিবীতে এত মানুষ আজও বেঁচে আছে কেন? ভিড় যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সশব্দ উত্তেজনায় জীবনের গুঞ্জন তুলে গাঁয়ের দিকে রওনা হল। আজ আসেনি কিন্তু তাদের জন্য অন্ন আসবে। খেতে তারা পাবেই। স্বয়ং ধনঞ্জয় সরকার তাদের সকলকে খাওয়াবেন। স্টেশনে আসা তাদের সার্থক হয়েছে। ঝোপে আর গাছে ছড়ান জোনাকিগুলি যেন টেপা টেপা সংকেতে সায় দিতে লাগল।

স্কুলের ঘরে মাধবের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুল আজ মাস দুই বন্ধ আছে। ছেলে হয় না বলে ধনঞ্জয় পুজোর ছুটি পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন। স্কুলের লাগাও হেডমাষ্টারের বাড়ি, মাধবের জন্য তিনি খাওয়ার আয়োজনটা করেছিলেন ভালোই। হেডমাষ্টারের স্ত্রী নিজে পরিবেশন করে তাকে খাওয়ালেন, পান এনে দিল তার মেয়ে। অতিথিকে ঘরের লোক করে নেওয়াটা গ্রাম্য ব্যবহার। তবে এক্ষেত্রে সেটা একটু খাতির করায় দাঁড়িয়ে গেল। স্কুলের মাষ্টারদের বেতন এক পয়সা বাড়ান হয়নি, এই দুর্দিনে তাদের দিন চলে না। এদিকে মাধব ধনঞ্জয়কে একটু বললেই এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে। এটুকু উহ্য থাকলে ভূপতির বাড়ির পারিবারিক আদর-যত্নে মাধব মুগ্ধ হয়ে যেতে পারত।

স্কুলের কেরানি শ্যামল এ বাড়িতেই থাকে। খাওয়াদাওয়ার পর আড়াল থেকে স্বার্থের কথাটা সেই সামনে টেনে আনল। শ্যামলের বয়স ত্রিশের

নিচে, অজীর্ণের চেহারা। বিনিয়ে বিনিয়ে শোকের শোভাযাত্রার মতো কথা বলে।

'আমাদের দিকে একটু না তাকালে আমরা তো আর বাঁচি না, মাধববাবু। বাবুর আপিসের পিয়ন পর্যন্ত রেশন পাচ্ছে, অথচ ইদিকে—' শ্যামল প্রায় কখনোই মুখের কথা শেষ করে না। যেটুকু বলা হলে বক্তব্য বোঝা যায় সেইটুকু বলেই সে সার্থক হাসির ভঙ্গিতে নীরবতার জের টানে।

মাধব হেসে বলল, 'আপনারা তো সুখে আছেন মশায়। ছুটিও ভোগ করছেন, মাইনেও পাচ্ছেন।'

ভূপতি বিমর্ষভাবে বললেন, 'সরকার মশায় হঠাৎ যে কেন স্কুলটা বন্ধ করলেন। প্রায় নব্বুইটি ছেলে অ্যাটেণ্ড করছিল—'

'নব্বুই ? বলেন কি সার !' মাধবের পান চিবানো বন্ধ হয়ে গেল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নিজে অ্যাটেণ্ডান্স রেজিষ্টার দেখে অ্যাভারেজ করে পাঠিয়েছি। বাবু বুঝি বিশ্বাস করেন নি ?' ভূপতি শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

আবার পান চিবোতে আরম্ভ করে মাধব বলল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাস জানি না মাষ্টার মশায়। বাবুকে জানেন তো, কখন কি খেয়াল চাপে কেউ টেরও পায় না। উনি রসিক পিয়নকে পাঠিয়েছিলেন ছেলে গুণতে। ও ব্যাটা এক নম্বর ধূর্ত। গিয়ে বলে কি, নিমতলায় গামছা কাঁধে ঠায় বসে থেকে এক এক করে' গুণে দেখেছে, তেত্রিশটি ছেলে স্কুলে এল।'

শ্যামল হাত কচলাতে লাগল। ভূপতি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেদিন—সেদিন হয়তো কিছু কম ছিল। মানে, কি জানেন, মেলা-টেলা থাকলে ছেলেরা আসে না।'

স্কুলের ঘরে শুতে গিয়ে ধনঞ্জয়ের আশ্চর্য উদারতার কথা ভাবতে

ভাবতেই মাধব সে রাত্রে ঘুমোল। তাকে পর্যন্ত ধনঞ্জয় জানান নি যে ভূপতি ছেলের সংখ্যা বাড়িয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন, মিথ্যাটা তিনি ধরে ফেলেছেন! মিথ্যাকে তিনি মিথ্যা বলে গ্রহণ করেন নি, ভূপতির প্রবঞ্চনা ক্ষমা করেছেন, চেপে গেছেন। এদের আতঙ্ক তিনি টের পেয়েছিলেন। স্কুল বন্ধ হলে মাইনেও বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে মরিয়া হয়ে ভূপতি অন্যায়টা করে ফেলেছেন অনুমান করে রাগ হওয়ার বদলে তাঁর অনুকম্পা জেগেছে। কী মহৎ তিনি! ফিরে গিয়ে সর্বাগ্রে মাধব তাঁর পদধূলি গ্রহণ করবে। তিনি যে জেনেছেন একথা জানিয়ে ভূপতিকে লজ্জা দেবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটা পর্যন্ত দমন করার মহত্ত্বেই ধনঞ্জয় মাধবের কাছে দেবতার চেয়ে বড় হয়ে যান। ভক্তির উত্তাপে মাধবের মোহ ঘন আঠালো হয়ে আসে।

দুঃস্বপ্ন দেখে রাত্রে তার দুবার ঘুম ভেঙে গেল। দুবারই শেয়ালের ডাক শুনে প্রায় আধঘণ্টা করে' সে জেগে রইল।

সকালে চা খেতে গিয়ে দিনের আলোয় মাধবের খেয়াল হল ধনঞ্জয় যাদের যুবতী বলেন ভূপতির মেয়েটি সেই পর্যায়ে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য মাধবের মনটা একটু খিঁচড়ে গেল। এর জন্যই কি ভূপতির প্রতি ধনঞ্জয়ের এত দয়া? স্বাদগন্ধহীন গেঁয়ো চা-টুকু গিলতে গিলতেই মানসিক বিশ্বাসঘাতকতার প্রক্রিয়াটি সে সামলে নিল। ওসব দোষ ধনঞ্জয়ের নেই। তিনি শুধু অধ্যবসায়ী কৃতী পুরুষ নন, চরিত্রবানও বটে। তাঁর শত্রুও একথা স্বীকার করবে। ভূপতির মেয়েকে হয়তো তিনি কোনোদিন চোখেও দেখেন নি। হয় তো শুধু শুনেছেন যে ভূপতির একটি যুবতী মেয়ে আছে। যাদের বাড়িতে যুবতী বোন বা মেয়ে আছে তাদের ধনঞ্জয় একটু প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। চাকরি দেবার সময় প্রত্যেকের পরিবারের খবর তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ কোনোদিন তাঁর কাছে

এসে খালি হাতে ফিরে যায় নি। মাধব জানে, ধনঞ্জয়ের এই সদাজাগ্রত সহানুভূতি সূর্যের আলোর মতো নির্মল। যুবতী মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কোন দুর্বলতা নেই, তাঁর সবটুকু সহানুভূতি শুধু যুবতী মেয়ের বাপ ভায়ের জন্য।

'অক্ষয়ের বোনটার খবর জানেন মাষ্টার মশায় ? নলিনীর ?'

'সে সদরে আছে।'

'সদরে নাকি ! শুনছিলাম একেবারে নিখোঁজ ?'

'না, সদরে নৃসিংহবাবুর রিলিফ ওয়ার্ক করছে।'

'বটে ? তবে যে শুনলাম নৃসিংহবাবুর ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে খেতে না পেয়ে ?'

'ঠিক পালিয়ে যায় নি, চলে গেছে। বলা হল অনেক, কারো কথা শুনল না। ওর মা তো ওকে গাল দিয়ে কিছু রাখেনি। শিববাবু, ভোলানন্দী এঁরা সবাই কিছু টাকা সাহায্য দিতে চাইলেন, সরকার মশায়কে বলে সব ঠিক করে দেওয়া হবে জানান হল, ও তা গ্রাহ্যও করল না। খালি বলতে লাগল, 'যান্, যান্, আপনারা যান্।' মাকে ফেলেই চলে গেল।'

শেষ কথাটায় মাধব মুচকে হাসতে থাকে। ওটা যেন বলাই বাহুল্য ছিল।

শ্যামল বলে, 'সে এক কাণ্ড মাধববাবু। মা টেনে হিঁচড়ে মেয়েকে আটকাতে চায়, মেয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় মাকে। বুড়ী কেন গায়ের জোরে পারবে অমন জোয়ান মেয়ের সঙ্গে! টানতে টানতে বেলতলা তক্ নিয়ে গেছ্‌ল। বুড়ী তখন হাঁউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। আমরা মেয়েটাকে ধমকে ছাড়িয়ে দিলাম।'

ভূপতির মেয়ের মুখখানা বিবর্ণ ম্লান দেখাচ্ছিল। তিনবার সে ঘরে এসেছে, গেছে। এসব কথা শুনে সে যেন সইতে পারছে না, থাকতেও

পারছে না না-শুনে। হঠাৎ সে বলল, 'নলিনী আমায় চিঠি লিখেছে বাবা। পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছে ওর মার জন্য।'

ভূপতি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আন্ তো চিঠিটা, দেখি কি লিখেছে।'

চিঠিখানা প্রথমে দেখল মাধব, সে উপস্থিত থাকতে প্রথম কিছু করার অধিকার আর কারো থাকতে পারে না। মস্ত লম্বা চিঠি, মনকে ঢেলে দেবার সব চেয়ে উপযোগী ব্যক্তিগত সস্তা ভুল ভাষায় লেখা বলে স্পষ্ট পরিষ্কার মানেতে আগাগোড়া ঠাসা। সবাই কি ভাবছে আর তার কি হবে ভেবে নলিনীর কান্না পাচ্ছে। বাজাতলায় পড়ে থেকে মরে গেলেই তার ভালো ছিল। নলিনী আর বাঁচতে চায়না, কিন্তু বেশ আছে সে দিনরাত খাটতে খাটতে মরে যাওয়ার মতো কাজের মধ্যে, তবে কিনা বুক ফেটে যায় মানুষের দুর্দশা দেখলে। নলিনীর দাদা তাকে বলত যে ভিক্ষে করা আর ভিক্ষে দেওয়া দুটোই সমান পাপ। কারো কাছে ভিক্ষে নেবে না বলেই তো সে চলে গেছে। ভিক্ষে নেবেও না, ভিক্ষে দেবেও না। তবে ভিক্ষে দেওয়ার কাজ যে সে করছে সেটা ভিন্ন। নিজে তো আর সে ভিক্ষে দিচ্ছে না, সে শুধু কাজ করছে। কাজ তো তাকে করতে হবে, তাই সে কাজ করছে। কি কাজ করতে হচ্ছে তা সে ভাবতে যাবে কেন? মানে, নলিনী শুধু কাজটাই করছে, আর কিছু নয়। যাদের সে খেতে দিচ্ছে ইচ্ছে করে দিচ্ছে না। ক্ষমতা থাকলে সে কিছুতেই দিত না। সবাই মরলেও দিত না। দাদার কথা নলিনী পালন করছে।

চিঠি পড়ে বোঝা যায় এই কথাটা বুঝিয়ে লিখতে নলিনী বেশ ফাঁপরে পড়েছিল। দুলাইনেই তার বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেটা তার বোধগম্য হয়নি, সম্ভব বলে ভাবতেও পারেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে লিখেও তার মনে সন্দেহ রয়ে গেছে যে মনের আদর্শ মনে রেখে কাজের জন্য কাজ করার নীতি-কথাটা সে বুঝিয়ে বলতে পেরেছে কিনা এবং ভূপতির মেয়ে বুঝবে কিনা।

চিঠি পড়ে মাধব বা ভূপতি কেউ কোনো মন্তব্য করল না। শ্যামল টেনে টেনে বলল, 'কাজিল মেয়েটা। যেমন ভাই তার তেমনি বোন। ভর্তি হতে চায়নি আমাদের এই স্কুলে? এ যেন মেয়ে স্কুল, ধেড়ে মেয়ে নিলেই হল। বলে কিনা মেয়েদের একটা সেকসান করুন। ওর হুকুমে মেয়েদের সেকসান খোলা হবে! ছেলেদের স্কুলেই ছেলে হচ্ছে না—'

'আমার চিঠি দিন!' ভূপতির মেয়ে ফোঁস করে উঠে শ্যামলের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।—'আপনি তো যেচে পড়াতে চেয়েছিলেন ওকে। রোজ গিয়ে পড়িয়ে আসবেন বলেছিলেন।'

ভূপতি শ্যামলের হয়ে অপরাধীর মতো বললেন, 'লেখাপড়া শেখার খুব ঝোঁক আছে মেয়েটার। বড় উত্যক্ত করে তুলেছিল। শেষে কি আর করি, আমার মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে পড়াতাম।' ভূপতি একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'আর মেয়েদের লেখাপড়া শেখা। ছেলেরাই এডুকেশন পাচ্ছে না, মেয়েরা কি করবে এডুকেশন দিয়ে?'

মাধব বলল, 'দাঁড়ান, মেয়েদের একটা স্কুল খুলিয়ে দিচ্ছি।'

ভূপতি চমকে গেলেন। শ্যামল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চলে যেতে যেতে ভূপতির মেয়ে থমকে দাঁড়াল।

'সরকার মশায় রাজী হবেন? কিন্তু মেয়ে তো বেশি হবে না!'

'দশটি মেয়ে তো হবে? তাই ঢের।'

ধনঞ্জয়ের ছোঁয়াচ লেগে লেগে মাধবের কি হয়েছে, হঠাৎ সৎকর্মের অদম্য প্রেরণা জাগে। মেয়ে স্কুল খোলবার চিন্তায় সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তাকে যে কমিটি গড়ে, ভলান্টিয়ার জোগাড় করে, সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা ঠিক করে, স্কুলের একটা অংশ ঘিরে এবং আরও বহু হাঙ্গামা করে অন্নসত্র খুলতে হবে সে ভাবনা প্রায় চাপা পড়ে গেল তখনকার মতো। ধনঞ্জয় রাজী হবেন। খুব সহজেই মাধব তাঁকে মেয়ে স্কুল খুলতে

রাজী করাতে পারবে। পড়ানোর কাজ দিয়ে তিন চার জন যুবতী মেয়ের উপকার করার সুযোগ ধনঞ্জয় ছাড়বেন না।

মাধবের কাছে এই নতুন পরিকল্পনা পেয়ে তিনি খুশি হবেন। ধনঞ্জয় খুশি হলে মাধবের হবে সুখ।

বাঙ্গাতলা হিতৈষিণী সভার কয়েকজন মাতব্বর সভ্য এবং স্কুলের অন্ত মাষ্টাররা এসে পড়ায় মাধবকে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত হতে হল। মনটা তার একটু আনমনা হয়ে রইল।

গাঁয়ের চারদিক ঘুরে আসবার ইচ্ছা মাধবের ছিল। দুপুরে বিশ্রাম করে বিকালের দিকে ভূপতি, শ্যামল এবং আরও দুজন হিতৈষিণী সভ্যের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে ভূপতির মেয়ের কাছ থেকে নলিনীর মার পাঁচটা টাকা চেয়ে নিল। নিজেই সে টাকাটা পৌছে দিয়ে আসবে।

'আর গোটা তিনেক টাকা দিয়ে আটটাকা করে দেব। বলবখন মেয়েই সবটাকা পাঠিয়েছে।'

'ভালোই তো।'

মুখে সায় দিলেও সকলে একটু শঙ্কিত হলেন। আট টাকাকে বারো চোদ্দ টাকা করতে মাধব আবার চাঁদা না চেয়ে বসে। মাধব সিনেমার স্বাদ পাচ্ছিল। গোপনে পাঁচ টাকাকে আট টাকা করে মা'র হাতে তুলে দিয়ে বলা তার মেয়ে পাঠিয়েছে!

'ছেলেবেলা খুব আদর করতেন। কত মোয়া আর তিলুড়ি যে খেয়েছি। হ্যাঁ, চন্দ্রপুলিও খাওয়াতেন। এখনো জিভে স্বাদ লেগে আছে মনে হয়। কি কপাল দেখুন মানুষের, উপযুক্ত ছেলে থাকতে কেউ দেখবার নেই।' সকলে একটু অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা গেল। নলিনীর মার উপযুক্ত ছেলে যে থেকেও নেই, এটা বড় খাপছাড়া সত্য।

ধনঞ্জয় দাতব্য ঔষধালয়ের কিছু দূরে নন্দীদের বাড়ির কাছে নলিনীর

মার বাড়ি। ঘর তিনখানা ভাঙাচোরা, উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ান। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে লাগছিল, উঠোনে পা দিতে গন্ধটা ঘন ও গাঢ় হয়ে উঠল।

দক্ষিণের ঘরে দরজা খোলা। পায়ের শব্দে একটা শেয়াল খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের কানাচ দিয়ে ডোবার পাশে বাঁশবনে চলে গেল।



বিলামসন

স্টিফেন এফ বিলামসনের মনটা সরল, কেবল বুদ্ধিটা একটু প্যাঁচালো, জাত বেনের যেমন হয়। দরকার না হলে অকারণে কখনো সে প্যাঁচ কষে না এবং প্যাঁচ যাতে গভীর হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকে। মিথ্যাকে সে আমল দেয় না। সাদাকে যদি বা কালো বলে, এমন জোরের সঙ্গে বলে এবং এতখানি তেজ আর আন্তরিকতা থাকে তার বলার মধ্যে, যে লোকে থতমত খেয়ে ভাবে তারই বোধ হয় ভুল হয়েছে। বিলামসনের সাহস দুর্জয়। যেখানে ভয়ের কিছু নেই, যেখানে প্রতিপক্ষ তার চেয়ে দুর্বল, সেখানে সে দুঃসাহসী। শঙ্কার কারণ থাকলে শঙ্কিত না হয়ে সে উদারভাবে সাহস দেখাতে বিরত থাকে, তাতে তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়ে যায়। অন্যায় সে কখনো করে না, অন্যায় করতে হলে আগে ঈশ্বরের, কর্তব্যের, মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে সে বিশ্ব জগতের কাছে ঘোষণা করে নেয় যে সেটা অন্যায় নয়, অতিশয় ন্যায়।

সাতাশ বছর বয়স হয়েছে বিলামসনের। মেহেদি রঙের চুলে সাদার ছোপ ধরেছে। মিসেস্ বিলামসনের বয়স হবে ছেচল্লিশ, তবে বয়স গোপন করার কৌশল ভদ্রমহিলা এত ভালো জানেন এবং ওই সাধনায় প্রতিদিন এত সময় ব্যয় করেন যে মনে হয় ত্রিশ বছরের যৌবনে যেন ভাঁটা ধরেনি। তবে জোয়ারের জল প্রাচীর তুলে আটকে দিলে তাতে যেমন শ্যাওলা জন্মায়, জল খারাপ হয়ে পচাপচা দেখায়, মিসেস বিলামসনের রূপও তেমনি হয়ে গেছে। বিশ বছরের মেয়েটির পাশে বিশেষ করে বদ দেখায়। মেয়েটির নাম অরেল্যো। অরেল্যো যে খুব বেশি রূপসী তা নয়, নীল চোখ, গালের উঁচু হাড় আর বৈচিত্র্যহীন ছিপছিপে গড়নে রূপ সৃষ্টি হয় না। তবু, ছেচল্লিশের সঙ্গে কুড়ির তফাৎ অনেক।

একটি ছেলে আছে বিলামসনের, আর্থার। অরেল্যোর চেয়ে আর্থার কিছু বড়। আর্থারের তেতাল্লিশটা বিভিন্ন রকমের টাই আছে।

বিলামসন সম্প্রতি সপরিবারে নগরগড়ে মহীধর রায়ের বাড়িতে বাস করছে। বাস করছে অনেকদিন, যদিও মহীধর তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল দিন কয়েকের জন্য। মহীধর অত্যন্ত অতিথিবৎসল, তাদের বংশে চিরদিন এই বাৎসল্যের প্রবল প্রকোপ দেখা গিয়েছে। বিলামসন নড়বার নামও করত না, তবু মহীধর প্রত্যেক সপ্তাহেই দু'চার বার তাকে আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করত।

বিলামসনেরা সপরিবারে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলত, 'অত করে বলবার দরকার নেই রায়। আমরা নিশ্চয় থাকব।'

কয়েক সপ্তাহ অতিথি হয়ে বাস করবার পর বিলামসন মহীধরের ম্যানেজার হয়ে বাস করছে। সেকেলে বিশাল তিনমহাল বাড়িটার গায়ে লাগিয়ে দক্ষিণে নদীর দিকে মহীধর যে একেলে ধাচের নতুন বাড়িটি তুলেছে, তাতে। বাড়িটিতে শোবার ঘরের সংখ্যাই হবে ডজন-

খানেক। অতিথি পরিবারটিকে প্রথমে মহীধর তিনখানা শোবার ঘর আর একটি বসবার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর বিলামসন নিজে কাজ করবার জন্য একটি অফিসঘর, আর্থারের জন্য একটি পড়ার ঘর এবং অরেল্যের জন্য একটি বসবার ঘর চেয়ে নিয়েছে। তারপর আরও একটি বাড়তি ঘর তার কি কারণে দরকার হয়েছে মহীধর ঠিক বুঝতে পারে নি। তারও পরে মহীধরের বাড়ির এই আধুনিক অংশটির সমস্তটাই বিলামসন আয়ত্ত করে ফেলেছে।

মহীধরের একটি বন্ধুর সপরিবারে আসবার কথা ছিল, নতুন বাড়ির একাংশেই তারা থাকবে। এ বাড়িতে পাঁচ সাতটি পরিবার একসঙ্গে আরামে বাস করে গেছে।

মহীধরের বন্ধু পরিবার এসে পৌঁছবার আগে বিলামসন বলল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে রায়। অন্য কোথাও ওদের যদি থাকবার ব্যবস্থা করে দাও, বড় ভালো হয়। ভেবো না, দেশীলোক বলে আপত্তি করছি। মোটেই তা নয়। তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার বনে না। তা ছাড়া তোমার ও বাড়িতে তো জায়গার অভাব নেই।'

তারপর আরও অনেকবার মহীধরের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসেছে কিন্তু বাড়ির নতুন অংশে কেউ স্থান পায়নি। কয়েকবার বিলামসন নতুন নতুন অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে আব্দার ধরেছে তার অংশে সে যেন একলা থাকতে পায়। এখন আর বিলামসনকে যুক্তি দেখাতে হয় না, কিছু বলতেও হয় না। অতিথি যারা আসে পুরানো বাড়ির সাতান্নটি ঘরের সব চেয়ে ভালো খান দশেক ঘরে তাদের থাকতে দেওয়া হয়, বিলামসনের শান্তি ভঙ্গ করার কথা মহীধর মনেও আনে না।

জেলার কালেক্টর জ্যাকসন সাহেব যখন সস্ত্রীক তিনদিন মহীধরের অতিথি হয়েছিলেন, তখন পুরানো বাড়িতেই তাদেরও থাকতে দেবার

ব্যবস্থা হয়েছিল, বিলামসন অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'মিষ্টার জ্যাকসনের সঙ্গে আমার সর্বদা নানা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে বুঝতে পারছ না, রায় ? নতুন রাস্তা, স্কুল, কারখানা, আরও কত বিষয়ে কত কথা বলতে হবে। ওরা আমার বাড়িতেই থাকবে।'

এই প্রথমবার বিলামসন মহীধরের নতুন বাড়িকে আমার বাড়ি বলে ঘোষণা করল। কিন্তু কথাটা যেন মোটেই খাপছাড়া শোনাল না তার মুখে।

জ্যাকসন সাহেবের পর এসেছিলেন স্মিথ সাহেব ও বেনেট সাহেব। এদের দুজনেরই পত্নীরা মিসেস বিলামসনের এবং ছেলেমেয়েরা আর্থার ও অরেল্যোর প্রাণের বন্ধু। সুতরাং এরাও যে বিলামসনের বাড়িতে বাস করে যাবে সেটা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল সকলের।

একটা রাজ্যের সমান মহীধরের জমিদারী—বিলামসনের তত্ত্বাবধানে দিন দিন জমিদারীর উন্নতি হতে লাগল।

লোকটা বিলক্ষণ কর্মঠ এবং উৎসাহী সন্দেহ নেই। নাইবা হবে কেন। পুষ্টিকর, উত্তেজক খাদ্য ও পানীয়ের অভাব নেই, বিশ্রাম সে কাজেরই অঙ্গ হিসাবে নেয়, অবসর বিনোদন তার অপরিহার্য নিত্যকর্ম, সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স দিয়ে মনকে সর্বদা তাজা রাখে, তার উপর বেনের মতো বাস্তববাদী বলে মানসিক কর্মের মানেই সে বোঝে না। মহীধরের বাড়িতে ও এষ্টেটে সে যে কত কি করেছে এবং করছে তার বিবরণ সত্যই চমকপ্রদ। পথঘাটের সংস্কার দিয়ে কাজ সুরু হয়। আশেপাশের গাঁয়ের লোক আজ নগরগড়ে নতুন পিচ ঢালা পথে উঠবার আগে ভালো করে পায়ের কাদা ধুয়ে নেয়। গরুর গাড়ি চলে চলে এতকাল সদরে যাবার বড় রাস্তার দফা নিকেশ করে দিত, মাইল পাঁচেক রাস্তায় এখন গরুর গাড়ির যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। ওপথে এখন মহীধরের, তার অতিথি অভ্যাগতদের এবং বিলামসনের মোটরগাড়ি হুস্ হুস্

করে চলে—খানা ডোবার জন্ত টিপে টিপে সাবধানে চালাতে হয় না। গরুরগাড়িগুলি চলাচল করে অন্ত পথে। একটু ঘুর হয়, সময় বেশি লাগে, আর কোন অসুবিধা নেই। রামপুর গাঁ থেকে হানাতিন্না আগে ছিল ক্রোশখানেকের পথ, এখন তিন ক্রোশের সামান্ত বেশি কি কম হবে। নগরগড় থেকে সদরের দূরত্ব গরুর গাড়িতে সাত মাইল বেড়ে গেছে। তবে বিলাসসনের বন্ধু স্মিথের কোম্পানী নগরগড় থেকে মালপত্র সদরে নিয়ে যাবার জন্ত আট দশটি লরি কাজে লাগিয়ে দেওয়ায় অনেক গাড়ির এখন আর খ্যাটর খ্যাটর করে সদরে যাবার দরকার হয় না।

মহীধরের বাড়ির কাছাকাছি নদীর ধারে একটা বিদ্যুত তৈরীর কল বসানো হয়েছে। মহীধরের বাড়িতে ঝাড়বাতি লণ্ঠন আর টানাপাখার পাট গেছে উঠে। ত্রিশবছর প্রতি সন্ধ্যায় আলো জ্বালার ভার যে লোকটির ছিল, তাকে ছাড়ানো হয় নি। পাখা টানার এগারটি ছেলেবুড়োর কাজ গেছে। বিদ্যুতের কল বসানো আর চালানোর খরচ উঠেও যাতে কিছু লাভ থাকে সে ব্যবস্থা বিলাসসন করেছে। নগরগড়ের অধিবাসীদের নিজের নিজের কাঁচা পাকা বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে রাজী করানোর সমস্তাটা তাকে মোটেই কাবু করতে পারে নি। অর্ধেক লোক বুদ্ধিমানের মতো নিজেরাই রাজী হয়েছিল। কাজেই, রাজী করাতে হয়েছিল মোটে বাকী অর্ধেককে। নগরগড়ের যে বাড়িতে সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টার মধ্যে বাতি নিভিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়ত, এখন রাত বারটা পর্যন্ত বাল্‌ব জ্বালিয়ে সে বাড়িতে সকলে জেগে থাকে।

আলো জ্বলুক বা না জ্বলুক, টাকা মাসে মাসে দিতে হবে। আলো না জ্বালিয়ে টাকা দেবার কথা ভাবতে অনেকের গা জ্বালা করে।

তিনটে কারখানাও বিলাসসন বসিয়েছে। তার মধ্যে কাঁচের কার-

খানাটিই সব চেয়ে বড়—স্যামুয়েল, পিটার অ্যাণ্ড ডেভিড্‌সন কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্টস। প্রস্তুত একটা কোম্পানীর মূলধন মহীধরের দেবার ইচ্ছা ছিল। তার এষ্টেটে তার জমিতে কারখানা বসাতে বিলামসনের বন্ধুরা শুধু পকেট থেকে টাকা ঢালবে, সহায়তা করা ছাড়া সে কিছুই করবে না, এটা তার কাছে কেমন লজ্জাকর মনে হয়েছিল। কেমিকেলের কারখানার সমস্ত মূলধন, অন্তত অর্ধেক, দেবার জন্য মহীধর উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যা হবার নয় তা তো আর হয় না। বিলামসন তাকে বুঝিয়ে বলল, 'সত্য কথা বলি রায়, এতবড় দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তোমার নেই। কি দরকার তোমার অত হাঙ্গামার? তোমার যথেষ্ট লাভ থাকবে। তোমার এষ্টেটের কত উন্নতি হয়েছে, আরও কত উন্নতি হবে ভাব তো!'

আরও অনেক কিছু বিলামসন করেছে এবং করছে। এষ্টেটের বিলি বন্দোবস্ত আদায়পত্র হিসাবনিকাশ ইত্যাদি ব্যবস্থায় যেখানে যতটুকু ঢিল ছিল সব এমন আঁট করে দিয়েছে যে সমস্ত এষ্টেট সে টানের চোটে টন্ টন্ করছে। নিয়ম হয়েছে অসংখ্য এবং নিয়মানুবর্তিতার কড়াকড়ি হয়েছে বিস্ময়কর। দেড় আনার গোলমাল নিয়ে দেড় ডজন চিঠি লেখালেখি হয়, প্রশ্ন, কৈফিয়ৎ, মন্তব্য, ব্যাখ্যা ইত্যাদি ষ্টেটমেণ্টে দেড় দিস্তা কাগজ লাগে, দেড়দিন খেটে একজন কেরানি স্থায়ী ফাইল তৈরি করে। কারও প্রতি বেআইনী অন্যায় হবার উপায় নেই, আইন ছাড়া এক পা চলা নিষেধ। সামান্য বলে কোনো ব্যাপারকে তুচ্ছ করা হয় না, বিচারের জন্য সোজা আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক ধমকেই সাড়ে চার টাকা খাজনা আদায় হয় বটে কিন্তু ধমক দেওয়া তো আইনসঙ্গত নয়। দুটো মিষ্টি কথায় আপোষে অনেক ব্যাপারের মীমাংসা হয় বটে, কিন্তু তাতে তো প্রেষ্টিজ থাকে না।

বিলামসন বলে, *'প্রেষ্টিজ বজায় থাকার ওপর সব নির্ভর করে রায়, এটা কখনো ভুলো না। প্রেষ্টিজ বজায় রাখা চাই, প্রেষ্টিজ।'*

এত কাজ ও দায়িত্বের বিনিময়ে বিলামসন মাসে মাসে মোটে দেড় হাজার টাকা নেয়। মহীধর অবশ্য তাকে থাকবার বাড়ি দিয়েছে। আসবাব দিয়েছে, চাকর বাকর দিয়েছে, খাদ্য এবং পানীয় যোগাচ্ছে, মাঝে মাঝে সে যে পার্টি দেয় তার খরচটাও দিচ্ছে, তবু ধরতে গেলে বিলামসন যত কিছু করেছে এবং করছে তার তুলনায় মাসে দেড় হাজার টাকা কিছুই নয়। দূর থেকে তাকে আসতে দেখলে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ চোখের পলকে উধাও হয়ে যেত বলে গোড়ার দিকে বিলামসনের বড় আপসোস ছিল। পালিয়ে যাবে কেন? কি দরকার পালিয়ে যাবার? যে যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক, সে কাছাকাছি গেলে সেলাম করুক, পালিয়ে গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়ার মতো অসভ্যতা করা কি উচিত? মাঝে মাঝে দু'চারজনকে ঘরের ভেতর থেকে টানিয়ে এনে বিলামসন তাদের সঙ্গে আলাপ করত।

সঙ্গের আর্দালিকে বলত, 'সেলাম করনে বোলো। বাত্‌লা দো।' সেলাম করা হলে কয়েকবার মাথা হেলিয়ে বলত, 'ডরতা কাহে? ডরো মৎ।' বলে আলাপ সাঙ্গ করে এগিয়ে যাবার আগে হাতের সরু বেতগাছা দিয়ে সপাং করে পথের ধারের আগাছার ডগাটি উড়িয়ে দিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখত, অভয় পাওয়া লোকটি কেমন চমকে উঠে ভড়কে যায়!

খুব বেশি রকম বেয়াদবি না করলে বেতগাছা সহজে মানুষের পিঠে পড়ত না। দীনু বাগদি একদিন অরেন্যের ঘোড়ায় চড়া দেখে বোকার মতো হাসছিল, লম্বা লাঠিটা দু'হাতে মুঠা করে ধরে সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁদারামের মতো হাসছিল। বিলামসন কি আর

জানত না এরকম করে হাসাটা যে অপমানকর অসভ্যতা দীনু তা জানে না। তাই রাগ করে নয়, দীনু যা জানে না তাকে শুধু সেটা জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তার নিকষ কালো পিঠের চামড়ায় বিলামসন চার পাঁচটা লম্বা দাগ এঁকে দিয়েছিল। দাগগুলি থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ার আগেই দীনু বাগ্দী গিয়েছিল পালিয়ে।

আরেকদিন বিলামসন সপরিবারে নদীর ধারে বেড়াতে আর পাখী শিকার করতে গেছে বিকালের দিকে। পাঁচু গোয়ালার ছেলে মধু মাঠের গরু নিয়ে ফিরছে বাড়ি। কালি নামে পাঁচুর একটি গরু ছিল একটু বেশি রকম চপল, মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার সময় তার চং যেত বেড়ে। এদিকে যেত, ওদিকে যেত, থমকে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে রুখে দাঁড়াত, হঠাৎ শিং নেড়ে চার পা তুলে ছুট দিত দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান হারিয়ে। তবে গুঁতোনোর স্বভাব তার ছিল না, দুবছর বয়সের মধ্যে একটি মানুষকেও সে গুঁতোয় নি। শিং নেড়ে যেদিক লক্ষ্য করে সে ছুটছিল তাতে বিলামসনদের হাত দশেক তফাৎ দিয়েই সে বেরিয়ে যেত। কিন্তু মিসেস বিলামসন আর অরেল্যে ভয় পেয়ে এত জোরে আর্তনাদ করে উঠল যে বিলামসন ও আর্থার দুনলা দুটি বন্দুকের চারটি টোটার ছর্‌রাগুলি কালির গায়ে ঢুকিয়ে দিল। মধু হাউমাউ করে ছুটে এলে এমন বিপজ্জনক হিংস্র জন্তুকে দড়ি ছাড়া ছেড়ে দেওয়ায় জন্ত হাতের বন্দুক দিয়ে বিলামসন কয়েক ঘা এবং আর্থার কয়েক ঘা মারল। আর এমনি ক্ষীণজীবী যুবক ছিল মধু যে সেই কয়েকটা ঘায়েই সেইখানে সে পড়ে গিয়ে হয়ে গেল অজ্ঞান!

ত্রিলোচন তরফদারের ছেলে ধূর্জটিকে বিলামসন এক দিন খালি হাতেই মেরে বসেছিল। ধূর্জটি সহরে কলেজে পড়ে, সিগারেট খায়। নদীর ধারে বাঁধানো নালায় বসে বিলামসন-পরিবার আশ্বিনের স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করছে, বলা নেই কওয়া নেই একহাত তফাতে বসে

পড়ে ধূর্জটী ফুস ফুস সিগারেট টানতে লাগল, ধোঁয়া উড়ে আসতে লাগল মিসেস এবং মিস বিলামসনের মুখে। আর্থার টানছিল সিগার, বিলামসন টানছিল পাইপ। ছেলের হাত থেকে সিগারটা টেনে নিয়ে বিলামসন তার জলন্ত প্রান্তটি চেপে ধরেছিল ধূর্জটির গলায়।

এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট হবে ভেবেছিল বিলামসন, হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কলেজে বিদেশী শিক্ষার কুফল প্রমাণ করতে ধূর্জটি বিনা দ্বিধায় সজোরে বিলামসনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল!

বাপ ব্যাটায় তখন চার হাতে ধূর্জটিকে মারতে লাগল। কিন্তু একালের বাবু ছেলে শুধু বেয়াদব হওয়া নয় গায়েও যেন তারা কি ভয়ানক জোর বাগিয়ে ফেলেছে, ঘুষি মারার কৌশল শিখেছে অকাট্য। দুজনে তাকে যত না মারল, একা সে ফিরিয়ে দিল তার দ্বিগুণ।

বিলামসনদের সঙ্গে সেদিন বন্দুক ছিল না।

ধূর্জটি কোঁচার খুটে নাকমুখের রক্ত মুছতে লাগল আর বিলামসনেরা নাকে রুমাল চেপে ধরে পা বাড়াল বাড়ির দিকে। বিলামসনের দুটি প্রকাণ্ড দুর্ধর্ষ প্রকৃতির কুকুর ছিল, চাকরের সঙ্গে তারাও প্রতিদিন হাওয়া খেতে বার হত। একটু এগিয়েই কুকুর দুটির সঙ্গে বিলামসনদের দেখা হয়ে গেল!

বিলামসন চিরদিনই চটপটে। কুকুর দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গিয়ে তাদের বাঁধন খুলে একটু তফাৎ থেকে ধূর্জটির দিকে লেলিয়ে দিল। তীরের মতো ছুটে গিয়ে বাঘের মতো সেই কুকুর ধূর্জটিকে একেবারে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

বিলামসন ভেবেছিল ছোকরাটাকে একটু নাস্তানাবুদ করে কুকুর দুটিকে ডেকে নেবে। ধূর্জটি মারাত্মক রকমের নাস্তানাবুদ হল বটে, কুকুর দুটিকে বিলামসনের আর ডেকে নেওয়া হল না। এখান থেকে গোয়ালাপাড়া বেশি দূরে নয়। নদীর ওপারেই বাগ্দীদের এক বস্তি,

অগ্রহায়ণের গোড়ায় এখন হাঁটু ডুবিয়ে হেঁটে নদী পারাপার করা চলে। চারিদিকে কাছে ও দূরে বিশ ত্রিশটি দর্শকের সমাগম বিলামসনদের সঙ্গে ধূর্জটির হাতাহাতির সময়েই হয়েছিল। এইবার তারা হৈ হৈ করে ছুটে এল। দশ বার জনের হাতে ছিল লাঠি, লাঠির ঘায়ে বিলামসনের কুকুর দুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল।

কুকুর দুটিকে না মেরেও ধূর্জটিকে বাঁচান যেত। কুকুর অতি প্রভুভক্ত জীব। কিন্তু বিলামসনের কুকুর বলেই বেচারিদের সেদিন প্রাণটা দিতে হল।

বিলামসন কিন্তু অস্বীকার করে বলল, 'ওসব মিছে কথা। ভয়ে ওরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।'

বিলামসনের ভাবগতিক দেখে কারো সন্দেহ রইল না যে তার কুকুরপ্রেম সত্যই বড় গভীর ছিল। কুকুরের শোকে সর্বদা মুখে সে গরর্ গরর্ আওয়াজ করতে লাগল পাগলা কুকুরের মতো। যখন তখন যাকে তাকে সপাং সপাং বেত মারছে, কথায় কথায় পাইকপেয়াদা আমলারা বরখাস্ত হচ্ছে, জরিমানায় জরিমানায় মাইনে কেউ পাচ্ছে না অর্ধেকের বেশি। চাপ দিয়ে দিয়ে কাবু করে লোক ঢুকিয়ে ঢুকিয়েও কারখানাগুলিতে কিছুতেই লোকের অভাব মিটছিল না, এবার একেবারে সোজাসুজি ধরে বেঁধে কারখানায় নির্বিচারে লোক ঢোকানো শুরু হয়ে গেল—নিজে না চষলে ক্ষেতে যার চাষ হবে না তাকে পর্যন্ত।

গোয়ালাপাড়া উঠে গেল এক মাইল তফাতে একটা জলার ধারে, ওখানে ছাড়া অন্য কোথাও তাদের ঘর তুলতে অনুমতি দেবার উপায় বিলামসন খুঁজে পেল না। নদীর ওপারের সেই বাগ্দীপাড়ার সকলকে পুরো একমাস মাটি ফেলে নদীর ধার উঁচু করার কাজে লেগে থাকতে হল।

অতি ক্ষুদ্র সে নদী, বছরে ছ্মাসের বেশি জল থাকে না, আজ পর্যন্ত এ নদীতে কোনদিন বন্যা হয়েছে বলে কেউ স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু বিলাসমনের ধনুকভাঙ্গা পণ, একটা মাস বেগার খেটে বন্যার হাত থেকে নিজেদের তারা বাঁচাবেই বাঁচাবে।

দিন এনে দিন কিনে তারা আধপেটা সিকিপেটা খেত, তিনদিন বিনা পয়সায় মাটিকাটার পর তাদের উপোস সুরু হয়ে গেল। যে হাতে লাঠি ধরে বিলাসমনের কুকুর ঠেঙ্গিয়ে মেরেছিল সেই হাতে কোদাল ধরার জোরও আর রইল না। তখন বিলাসমন একটা কারখানা থেকে অগ্রিম মজুরি আনিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল কিন্তু মাটিকাটা বন্ধ হল না। গুর্খা দরোয়ানেরা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পুরো একটি মাস তাদের দিয়ে তাদের নিজেদেরই মঙ্গল করাল।

একমাস শয্যাশায়ী হয়ে থেকে ধূর্জটি সেরে উঠল। মনে হল, বিলাসমনের কুকুরের কামড় খেয়ে তার মাথাটাও বিগড়ে গেছে। শোভায় বিচিত্র এই যে একটা সুন্দর জগৎ আছে, সুখ শান্তি আরামের মতো অপূর্ব আশীর্বাদ আছে, জীবনে একশ দেড়শ টাকার চাকরি আর সুন্দরী বৌ প্রভৃতি বিস্ময়কর সম্ভাবনা আছে অদূর ভবিষ্যতে, এসব সে যেন স্রেফ ভুলে গেল। দিবারাত্রি টো টো করে ঘুরে ঘুরে অন্য সব মাথাগুলি বিগড়ে দেবার চেষ্টা ছাড়া তার যেন আর কাজ রইল না।

মাথা প্রায় সকলেরই কমবেশি খারাপ হয়েছিল, তবু সে মাথাগুলি বিগড়ে দিতে কী পরিশ্রমটাই যে করতে হল ধূর্জটির! এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল মাথাগুলি।

কয়েকজন শিষ্য জোটায় অতিকষ্টে মাথাগুলিকে ধূর্জটি কাছাকাছি এনে ফেলল। কি যেন ঘটে গেল তখন নিরীহ গোবেচারী মানুষগুলির মধ্যে, চারিদিকে অভিশাপ শোনা যেতে লাগল, বিলাসমন নিপাত যাও!

ব্যাপার দেখে মহীধর বিব্রত হয়ে বলল, 'তুমি বরং কিছু দিন বাইরে থেকে ঘুরে এসো বিলামসন।'

বিলামসন মৃদু হেসে বলল, 'ভেবো না রায়। দুচারজন অকৃতজ্ঞ বদমায়েস যদি চেঁচাতে চায়, চেঁচাতে দাও। বেশির ভাগ লোক আমাকে পছন্দ করে, আমাকে চায়।'

'তবে একটু নরম হও।'

'ক্ষেপেছ? এই তো শক্ত হওয়ার সময়!'

মহীধর তবু ইতস্তত করছে দেখে অরেল্যো তাকে ইসারা করে নিজের বসবার ঘরের নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল। তাকে কৌচে বসিয়ে পিছন থেকে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে মাথায় মাথা রাখল। মহীধরের রঙ কালো, রীতিমত কালো। তাকে অরেল্যো এইভাবে পিছন থেকে আদর করে। কারণ, মহীধর তার মুখ দেখতে পায় না বলে মুখের ভাব গোপন করার কষ্টটা তাকে করতে হয় না।

'আমায় দেখলেই এইটুকু এইটুকু বাচ্চা ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে মারছে। কত বিস্কুট আমি খাইয়েছি ওদের! সেদিন যে কজনকে চাপা দিয়েছিলাম, সেটা কি আমার দোষ? রাস্তার মাঝখানে ওরা খেলা করবে, দূর থেকে হর্ণ দিলে সরবে না, কাছাকাছি এসে অত স্পীডের মাথায় কেউ গাড়ি থামাতে পারে? তাই বলে আমাকে দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে মারবে! কি বলে তুমি বাবাকে চলে যেতে বলছ, ওদের অত্যাচার চুপচাপ সইতে বলছ?'

মহীধরের মাথা ঘুরতে থাকে। অরেল্যো তার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব, রুচি, কৃষ্টি, ক্লাব, হোটেল, সিনেমা, ট্রেণ, মোটর, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ, বেতার, সিভিল-কোড, পেনাল-কোড, ডেমোক্রেসি প্রভৃতির অভ্যস্ত চেতনার মতো। মনে হয়, অরেল্যোর অভাবে সে অচেতন হয়ে যাবে।

বিলামসনের ভয় তো আছেই, অরেল্যোকে হারাবার ভয়ও তার কম নয়। ভয়টা কমতে চায় না কিছুতেই। মহীধর কাবু হয়ে থাকে।

মহীধর ব্যাকুল হয়ে উঠলেও বিলামসনেরা কিন্তু যা কিছু ঘটতে লাগল সমস্তই তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে লাগল। গুলি করে, লাঠি মেরে, বেতিয়ে, বেঁধে রেখে, লুট করে, আগুন দিয়ে, বিলামসন জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। উৎসাহ উদ্দীপনা ও উত্তেজনার নেশায় সে যেন হয়ে গেল নতুন মানুষ। মুখে শুধু তার ফুটে উঠতে লাগল, আতঙ্ক ও আপসোসের কতগুলি রেখা।

একদিন রাত্রে খবর এল, পরদিন সকালে নিষিদ্ধ পথে পাঁচশো গরুর গাড়ি চলবে। সাধারণের রাস্তা সেটা নয়, দয়া করে যে রাস্তায় সাধারণকে পায়ে হেঁটে অথবা রবার টায়ারের গাড়িতে যেতে দেওয়া হয়, বিলামসনের সেই পথে বিলামসনের হুকুম তুচ্ছ করে কাঠের চাকাওলা পাঁচশো গরুর গাড়ি একসঙ্গে সদরে রওনা হবে।

মহীধর কাতর হয়ে বলল, 'যাক না বিলামসন?'

বিলামসন বলল, 'ক্ষেপেছ? তাই কখনো যেতে দেওয়া যায়?'

মহীধর তবু ইতস্তত করছে দেখে অরেল্যো তাকে ইসারা করে নিজের বসবার ঘরের নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় পরপর পাঁচশোখানা গরুর গাড়ি বিপুল ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে নগরগড় থেকে সদরে রওনা হল। বিলামসনের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল, মাইল দুই এগিয়ে যাবার পর গাড়িগুলি থামিয়ে প্রত্যেক গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। গাড়ি পিছু গড়পড়তা পেট্রোল খরচ হল তিন গ্যালন। আরও কম পেট্রোলেই কাজ হত কিন্তু এসব ব্যাপারে কার্পণ্য করা বিলামসনের স্বভাব নয়।

গোয়ালারা ক'দিন থেকে তাদের পুরানো ভিটের ছোট ছোট চালা

তুলতে আরম্ভ করেছিল। বিলামসন ভেবেছিল ঘরগুলি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আজ আগুনের নেশা চেপে যাওয়ায় গাড়ির পর সমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত চালাগুলিতেও সে আগুন ধরিয়ে দেবার হুকুম দিল।

এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডে মানুষ মরল মোটে একজন। ধূর্জটি সামনের গরুর গাড়িটিতে ছিল। গাড়োয়ানেরা পালাবার অবসর পেল কিন্তু ধূর্জটিকে বেঁধে রাখায় গাড়ির সঙ্গে সেও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই গাড়িটাতে পাঁচ ছ গ্যালন পেট্রল ঢালা হয়েছিল। গাড়োয়ান ও দর্শকদের কারো কারো শরীরে একটু ছ্যাঁকা লাগল এবং গোয়ালাদের কয়েকজনের মাথা একটু ফেটে গেল। আর কিছুই হল না।

অপরাহ্নে নগরগড়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মহীধরের কাছে দরবার করতে গেলেন। বললেন, 'এবার আপনি বিলামসনকে বিদায় দিন।'

মহীধর বিব্রত হয়ে বলল, 'কি করে বিদায় দেব?'

'চলে যেতে বলুন।'

'যেতে বললে কি যাবে!'

কথাটা তার নিজের কানেই একটু অদ্ভুত শোনাল বৈকি! তার জমিদারী, তার বাড়ি, তার লোকজন, তার পয়সা—সে যেতে বললে বিলামসন যাবে না একথার যেন সত্যসত্যই কোনো মানে হয় না।

ভদ্রলোকেরা বললেন, 'ওকে যেতে বলুন, আজকেই যেতে বলুন। ওর সঙ্গে আপনিও কেন মারা পড়বেন?'

মহীধর সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, দেখি বলে কি হয়। আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না, একটু সময় দিন আমাকে।'

বিলামসনেরা বৈকালিক চা পান করছিল, মহীধর সেখানে গিয়ে চা খেতে অস্বীকার করে গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'এবার সত্যি সত্যি

তোমার মাস ছয়েকের বিশ্রাম নেওয়া দরকার বিলামসন। তুমি কালকেই যাও। আমি এখুনি ট্যাটরা দিয়ে দিচ্ছি যে তুমি কাল থেকে ছমাসের ছুটিতে বেড়াতে যাবে।'

বিলামসন শুধু বলল, 'ক্ষেপেছ? এ অবস্থায় তোমাকে ফেলে কি আমি যেতে পারি! আমি গেলে কি অবস্থা দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? সবাই মারা পড়বে।'

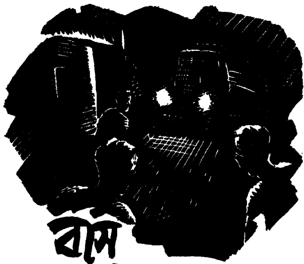
মহীধর ভীরু নয় কেবল মনের গড়নটা তার খাপছাড়া। জীবনে কোন-দিন যে কথা উচ্চারণ করতে পারবে ভাবে নি, আজ অনায়াসে বিনা দ্বিধায় সেই কথাগুলিই বলে ফেলল, 'তা হোক, তোমায় আমি আর থাকতে দিতে পারি না বিলামসন। তোমার আমার দুজনের ভালোর জন্যই তোমাকে আমায় যেতে বলতে হচ্ছে। তুমি কাল সকালে রওনা হবে। আমি এখুনি খবরটা ছড়িয়ে দিচ্ছি, শুনলে সকলে শান্ত হবে।'

বিলামসন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'তোমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে রায়। আমি চলে যাব শোনা মাত্র ওদের সাহস বেড়ে যাবে, উত্তেজিত হয়ে তোমার ঘরবাড়ি কাছারি আক্রমণ করবে, লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। আমি আছি বলেই ওরা কিছু করতে পারছে না, তা জানো?'

মহীধর আমতা আমতা করে বলল, 'তা হোক। এ অবস্থায় ওসব ভয় করলে চলে না।'

অয়েল্যে ক্রমাগত ইসারা করছিল, মহীধর জোর করে কার্পেটের দিকে চেয়ে রইল।

বিলামসন নিজে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে বোতল নিয়ে এল, গ্লাসে ঢেলে মহীধরের সামনে ধরে দিয়ে বলল, 'খেয়ে ছাখো খাসা জিনিস। তারপর এস আমরা মাথা ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করি। কর্তব্যের চেয়ে বড় কিছু নেই রায়। আদর্শের জন্য দরকার হলে প্রাণও দিতে হয়। ঈশ্বর যে নির্দেশ আমার দিয়েছেন আমাকে তা মানতেই হবে।'



বাস

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধানো পাথুরে রাস্তার খানিক তফাতে আসল খড়পা গ্রাম। গ্রামটি ছোট, কিন্তু তারই একটি শাখা রাস্তার দুপাশে গড়ে উঠেছে। কয়েকটি ঘরবাড়ি, দোকান ও আড়ত। এদিকে তেইশ মাইল দূরে সদর সহর, ওদিকে সতর মাইল দূরে মহকুমা সহর। ছোট বড় দুটি সহরের মধ্যে একটি বাস যাতায়াত করে। সদর থেকে সকালে যায় মহকুমায়, মহকুমা থেকে বিকালে ফেরে সদরে। যাত্রীরা অধিকাংশই সদর ও মহকুমায় আসা যাওয়া করে মামলার খাতিরে। কোর্ট বন্ধ থাকলে বাসও সেদিন বন্ধ থাকে।

খড়পায় বাস থামে এবং জল নেয়। যাত্রীরা গজেন ও রাজেনের দোকানে ভাগাভাগি করে খাবার কেনে, জগতের চায়ের দোকানে চা পান করে। রঘুনাথের দোকানে খড়পার বিখ্যাত তাঁতের কাপড়-গামছা দর

করে। মধু মাইতির পান বিড়ির দোকানে পান বিড়ি কেনে—কেউ কেউ সস্তা সিগারেট। দোকান আরও কয়েকটি আছে, ঘনশ্যাম দাসের একাধারে মনিহারী, মুদিখানা ও লোহার জিনিসের দোকান, নিতাই সামন্তের বাসনের দোকান, রঘু সামন্তের কামারখানা, আর ধনেশ সাহার ধান চালের আড়ত। আড়তে ধান প্রায় থাকেই না, দুচার বস্তা চাল কেবল মজুত দেখা যায়। কে যে কখন সে দুচার বস্তা চাল কিনে নিয়ে যায় এবং কোথা থেকে আবার দুচার বস্তা চাল আড়তে আসে, খড়পার সকলেই তা জানে কিন্তু বলার অধিকার নেই জেনে উচ্চবাচ্য করে না।

উপাধিহীন ডাক্তার দণ্ডধারী মাইতির ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানও এখানে আছে। আড়াই হাত উঁচু ও দেড় হাত চওড়া একটি নীল নীল কাঁচ লাগানো আলমারিতে ওষুধ এবং সেই অনুপাতে একটি ছোট পালিশহীন কাঠের টেবিলের সামনে টুলে উপবিষ্ট স্বয়ং ডাক্তার দণ্ডধারী মাইতি, টেবিলে দুখানা পাতা এবড়ানো বই, হিসাবের খাতা, কাঠের দোয়াতদান ও বুক পরীক্ষার একনলা যন্ত্র। এখানকার সবচেয়ে নতুন এই ডাক্তারী দোকানটিকে সবচেয়ে প্রাচীন মনে হয়।

ডাক্তার মাইতির পশার আছে। তার ওষুধের দাম কম, ভিজিটের টাকা কম অথচ চিকিৎসা আশ্চর্য ফলপ্রদ। পাঁচ দশ মাইল দূরের গাঁ থেকেও তাকে ডাকতে আসে। তবু, দণ্ডধারীর মক্কেলের সংখ্যা বেশি বলা যায় না। এ অঞ্চলে বসতি বড় কম, গাঁগুলি সব দূরে দূরে। সাঁওতালদের বস্তি বাদ দিয়ে খড়পার দশ মাইলের মধ্যে পনেরটির বেশি গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ। এইসব গ্রামের কোনো কোনোটি আবার দশ বারটি গৃহস্থের ঘরবাড়ি নিয়েই সম্পূর্ণ।

খড়পার পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে শালবন। বনের বহিঃরেখা দক্ষিণ দিকে ক্রমে ক্রমে বাঁক নিয়েছে পুবে এবং উত্তর দিকে ক্রমে ক্রমে বাঁক

নিয়েছে পশ্চিমে। উত্তরে গাঁয়ের কাছাকাছি যে শালতরুরেখা চোখে পড়ে সেটা বন নয়, একশো গজের চেয়েও অগভীর এলোমেলো শাল গাছের লম্বা একটা ফাঁকি। ওপাশে ফাঁকা মাঠ আর ক্ষেত আছে, মাইলখানেকের মধ্যে বাতুলী গাঁ, যেখানকার 'বাবরসা' কয়েক বছর আগেও মুখে দিলে গলে যেত। বাতুলী থেকে পুবে এক ক্রোশ দূরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার প্রথম বাঁক চোখে পড়ে, খড়পায় যা অদৃশ্য। ওই বাঁক থেকে রাস্তাটি সাপের মতো এঁকে বেঁকে গিয়েছে মহকুমার দিকে। পুবের শাল বনও বড় বা খাঁটি বন নয়। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরেও বটে। বনের মতো শালবন শুধু পশ্চিমে। খড়পা পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এই বনে প্রবেশ করে, সাত আট মাইল গিয়ে বনের অপর প্রান্ত পাওয়া যায়। এতখানি পথের গা ঘেঁষে দুপাশে থাকে শুধু শাল —সিধা, নিশ্চল, ভূমি-প্রোথিত উদ্ভিদ সেনার বিরাট বাহিনীর মতো।

খড়পায় এখন সূর্যাস্ত ঘটছে।

সূর্য শালবনের আড়ালে গেলে রোদ ফুরিয়ে শুধু আলো থাকে, দিগন্তের আড়ালে যাবার সময় আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। স্থানীয় লোকে বলে, সূর্যের নাকি একবার ক্রোধ হয়েছিল। আকাশে বাতাসে লেগেছিল আগুন, মাটি পাথর পুড়ে গিয়েছিল। সব দেবতারও যিনি দেবতা তিনি সূর্যদেবের ক্রোধ শান্ত করলেন।

সূর্য। হে বিষ্ণু, হে জগৎপতি, আমার ক্রোধ সত্য।

বিষ্ণু। তোমার ক্রোধ সত্য।

সূর্য। ক্রোধ ত্যাগ করলে আমি সত্যভ্রষ্ট হব। আমি নিভে যাব।

বিষ্ণু। হে সূর্য, তুমি সত্য রক্ষা কর। দুই বিন্দু ক্রোধ দুই দিবাভাগে সঞ্চিত কর। ক্রোধে তোমার উদয় হোক, ক্রোধে তুমি অস্ত যাও।

সূর্যের সেই ক্রোধে এখানকার মাটি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে— উর্বর, অকৃপণ মাটি। বর্ষার প্রথম জলধারা মাটিকে নরম করে দিলে

তবে এ মাটিতে লাঙ্গলের ফলা বসে, বর্ষায় সরস হলে তবে এ মাটিতে বীজ বেঁচে থাকে, অঙ্কুরিত হয়; তারপরেও বর্ষার কৃপাতেই অঙ্কুর বড় হয়ে ফসল ফলায়। কতবার বর্ষার খেয়ালে মানুষকে মাঠে বীজ ছড়াতে হয়েছে দুবার তিনবার—আধহাত উঁচু চারা, ফসল ধরবার আগের চারা, কতবার ঝলসে পুড়ে গেছে। বর্ষার খেয়াল খানিকটা বনের বৃষ্টি সামলে নেয়—কিন্তু বন দিন দিন ছোট হচ্ছে, আগের মতো আর তার ক্ষমতা নেই। বনের গাঁ ঘেঁষা আর বনের ভিতরের জমি শুধু বনের প্রচুর স্নেহ আজও পায়।

এবার খড়পাকে বর্ষা ফেলেছে বিপদে। অসময়ে একটু দেখা দিয়েই কোথায় কোন দেশে যে চলে গেল এবারের বর্ষা, সময় পার হয়ে আবার অসময় হল, তবু তার দেখা নেই। এবার আসুক বর্ষা। আজ না আসে, কাল আসুক। শেষ বেলায় একপ্রান্ত ধূসর করে বিদ্যুতের চমক দিতে দিতে বাতাসের বল্গা ধরে মহাসমারোহে আকাশ ছেয়ে আসুক। ওগো মা কুণ্ডেশ্বরী—আসুক। নইলে যে বড় বিপদ হবে গো মা। একদিন একরাত উপোসী থেকে তোমায় পাঁচ পয়সার ভোগ দেব মা—আসুক।

গরু মহিষ নিয়ে গোবর্ধন বাড়ি ফিরছিল। ছেলেটা মহিষের পিঠে চেপে বসেছে। গোবর্ধনের দুটি মহিষের রঙ বাদামী ধাঁচের, অর্জুনের মহিষ-গুলির মতো নিকষ কালো নয়। হাড়পাঁজরা সব গোনা যায় তার দুটি মহিষের, পিঠের উঁচু হাড়টার ওপর বসে ছেলেটা কি আরাম ভোগ করছে কে জানে! তিনটি গরু। আর বলদ দুটিও তার কঙ্কালসার, তবু জমকালো চেহারার জন্ত মহিষ দুটির শীর্ণতা বেশি চোখে পড়ে। কি প্রকাণ্ড কালান তার ওই দুব্বা'র, দুদিন ভালো করে খাওয়াতে পারলে কি দুধটাই ও দেয়। খেয়ে যেন ও নিজের দেহ পুষ্ট করে না, দুধে পরিণত করে তার জন্ত কালান ফুলিয়ে রাখে। তার ছেলেকে পিঠে

নিয়ে ধীর মন্থরগতিতে ছুব্‌বাকে গাঁয়ের দিকে চলতে দেখে এক সময় গোবর্ধনের বুক বা মন কোথায় যেন বেশ জ্বালা করে।

মনটা গোবর্ধনের ভালো ছিল না। চোখে জল আসবে টের পেয়ে জোর গলা খাঁকারি দিয়ে সে গরু মহিষকে তাড়া দেয়—টকাস্, টকস্. হেই-ই! চ্চঃ, চ্চঃ।

রাস্তার ধারে তৃণহীন শক্ত মাঠ। প্রতি পদক্ষেপে যেন ফিরে আঘাত করে। রাস্তায় উঠে গোবর্ধন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

বিকালে বাসের প্রতীক্ষায় পথপ্রান্তের খড়পা যেমন চঞ্চল হয়ে থাকে, এখনো তেমনি চঞ্চল হয়ে আছে। চঞ্চল এবং উদগ্রীব হয়ে আছে।

'কি ব্যাপার গ?'

'বাস এসে নি।'

'এসে নি? না?'

'উঁহুঁক। সদরে না গেলি মোর চলবে নি কিনা, শালার বাস তাই আজ এসবে নি তো মোকে লিয়ে যেতে!'

পুঁটলি হাতে শ্রীধন পাল অনেকক্ষণ হল অস্থির হয়ে এদিক ওদিক চলা-ফেরা করছে। পূব দিকে যতদূর রাস্তা দেখা যায় তাকিয়ে থাকছে, জগতের চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিটায় ধপ্ করে বসে বিড়ি ধরাচ্ছে এবং কয়েক মিনিট পরেই আবার উঠে অস্থির হচ্ছে। কাল তার মস্ত মোকদ্দমা আছে সদরে। সদরে পৌঁছতে না পারলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। দেড়শো পৌনে দুশো টাকার সর্বনাশ!

গোবর্ধনের গরুর গাড়ি ঠিক নেই, চাকা মেরামত করতে হবে। বলদ আছে। গাড়ি একটা হয়তো ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।

'বাস না এসে তো মোর গাড়িতে যেও'খন। খেয়ে লিয়ে রওনা দিলে—' গোবর্ধনের প্রস্তাবে শ্রীধনের মুখে ভেংচি দেখা দিল। 'গরুর গাড়িতে?

দুপুর রাতে বন পেরিয়ে নিয়ে যাবি তোর গরুর গাড়িতে? রাতে কটা বাঘ রাস্তায় হাওয়া খেয়ে বেড়ায় জানিস্?'

নটবর ঠাকুর মৃদু হেসে বলল, 'গণ্ডা তিনেক, আর কত!'

দণ্ডধারী ডাক্তারের ভাগে পাশ দিয়ে আসল খড়পার দিকে যাচ্ছিল, বলে গেল, 'বাঘগুলোও হন্তে হয়ে আছে। একটা মানুষে আগে ওদের চারবেলা পেট ভরত, এখন একবেলা আধপেটা হয়। দীনু সেদিন বাঘ দেখে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল, বাঘ তাকে ছুঁচাবার শুঁকে গর্জন করে চলে গেল। হাড় চামড়া বাঘ খায় না।'

পেটের কথায়, খাওয়ার কথায়, ক্ষুধার কথায় গোবর্ধনের হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা কুমড়ো কাল সে নামিয়েছিল, গাঁয়ের কেউ ভালো দর দেয় নি। নটবর ব্রাহ্মণত্বের দাবীতে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল দশ পয়সা বাকী দামে। বাসের যাত্রীদের কারো কাছে হয়তো কুমড়োটা বেচা যেতে পারে। অবশ্য বাস যদি আসে। কেউ কি জানে না কি হয়েছে বাসের, কেন বাস এখনো আসে নি আজ?

দেখা গেল এ খবরটা সকলেই জানে। সেন সাহেব সদরে ফিরবার পথে দয়া করে তাঁর গাড়ি থামিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে বাস বিগড়ে গেছে, আসতে দেরি হবে। কি রকম বিগড়ানো বিগড়েছে বাস? কত দেরি হওয়া সম্ভব বাসের আসতে? এসব খবর সেন সাহেব দেন নি। খুঁটিনাটি বিবরণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পীড়ন করার ভরসাও অনেকের ছিল না। কেবল ডাক্তার দণ্ডধারী আর গজেন সাহস করে দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে গিয়েছিল।

দণ্ডধারী আরম্ভ করেছিল, 'সার—'

গজেন আরম্ভ করেছিল, 'হুজুর—'

তখন হুস করে বেরিয়ে গিয়েছিল সেন সাহেবের গাড়ি। শ্রীধন যদি তখন এখনকার মতো মরিয়া হয়ে থাকতো, সে হয়তো সেন সাহেবের

কাছ থেকে বাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আদায় করে ছাড়ত। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঘাঁটাতে শ্রীধনও কম বিমুখ নয়। তবে, স্বার্থ মানুষকে শক্ত করে, বিপদ সাহস যোগায়। তাছাড়া গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বাস সম্পর্কে একটু বিশদ বিবরণ জানতে চাইলে তার উপর দিয়ে মিঃ সেন গাড়ি চালিয়ে দিতে পারতেন না। সে দিন-কাল যে আর নেই, শ্রীধনের পর্যন্ত তাতে বিশ্বাস জন্মেছে।

বাস কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। তবে শেষ পর্যন্ত এসে যে পৌঁছবে তাতে অনেকেরই সন্দেহ নেই। সেন সাহেব স্পষ্টই বলে গেছেন বাস আসবে—দেরি করে আসবে। বাস কি না এসে পারে? কুমড়ো বিক্রীর আগ্রহে গোবর্ধনেরও মনে হল, বাস আসবে। বাড়ি গিয়ে কুমড়োটা এনে রাখা ভালো। কখন বাস এসে পড়বে কে জানে! গরু মহিষ তার তখন ঘরে চলে গেছে। গোবর্ধন তাড়াতাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ে যাবার সরু মাটির পথে নেমে গেল। গাঁয়ের কোনো ঘরেই এখনো আলো জ্বলেনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য যে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে আবার নিভিয়ে দেওয়া হয় ঘরে ঘরে তেলের অভাবের জন্য, সে দীপ-গুলির আর জ্বলে উঠতে বেশি দেরি নেই, দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে।

প্রতিদিনের মতো শ্রীমন্তসহায় পুরানো মন্দিরের সিঁড়িতে এসে বসেছে। প্রাচীন বিষ্ণু মন্দির, এদিকে এরকম বহু মন্দির দেখা যায়। খড়পার মন্দিরের পাথরে ফাটল ধরে আজ পর্যন্ত একটিও আগাছা গজায় নি। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কোথা থেকে এক সন্ন্যাসিনী এসে বিষ্ণুহীন মন্দিরে কুণ্ডেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব যুগে বিষ্ণুর জন্য নির্মিত মন্দিরটি সেই থেকে সিঁদুর ঢাকা কুণ্ডেশ্বরী দখল করে আছেন। এ সময় মন্দিরের সিঁড়িতে বসে প্রতিদিন শ্রীমন্তসহায় গাঁয়ের লোককে আশ্চর্য সব কথা শোনায়। মানুষের আগের কথা, মাঝের কথা,

আজের কথা, জমির কথা, চাষীর কথা, কলের কথা, কুলির কথা, টাকা এবং গরীব ও বড়লোকের কথা। কখনো অনর্গল বলে, বোঝা যায় না। কখনো উদাস কণ্ঠে, কখনো মৃদু মৃদু রহস্যের সুরে বলে—কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না, শ্রোতাদের মনে গভীর অস্বস্তি জাগে। কখনো একেবারে তাদের ভাষায় সে বলে, তারা বুঝে শুনে থ' বনে যায়। সমাজ সংসার সব মিছে? ভাঙতে হবে, গড়তে হবে? টাকার খেলা ফক্কিকার, লুটলে অনেক থাকে, নইলে থাকে না? বড়লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভগবানের শাস্ত্রে বে-আইনী—সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার তাদের যারা গরীব?

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে শ্রীমন্তসহায় বলে, 'উঁহু, তোমাদের এ সব বলা তো উচিত হচ্ছে না! গাঁ ছেড়ে বাইরে যাওয়া বারণ, ঘর থেকে বেরুতে পাব না শেষে! রামাবতার আবার সব শুনলো।'

থানার রামাবতার সোৎসাহে বলে, 'ঠিক বাত হায়। গরীবকা লোহু পিনেসে ধনী বনতা, নেহি তো নেহি বনতা। জওহরলালজী তো—'

'একটা গান শোন রামাবতার।' বলেই শ্রীমন্তসহায় গলা ছেড়ে হিন্দী গান ধরে দেয়।

আধ ঘণ্টা পরেই হয়তো দেখা যায় শ্রীমন্তসহায় ডাক্তারখানায় বসে ওষুধপত্রের হিসাব দেখছে, ভিজিটের টাকার বখরা নিয়ে মৃদু কোমল সুরে দণ্ডধারী মামার সঙ্গে কলহ করছে, আর নয় তো পরিদর্শন করছে তার যে কাঠ চালান যাবে তার ব্যবস্থা। ওষুধের দোকানের আসল মালিক শ্রীমন্তসহায়, দণ্ডধারীর পশারও দাঁড়িয়েছে তারই জন্য। গোড়াতেই একটা বখরার ব্যবস্থা স্থির হয়েছিল। খুব সহজ ব্যবস্থা—দোকানের লাভ আর ডাক্তারির আয় যত হবে সেটা দুজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে আধাআধি। যতদিন এই উপার্জনে দুই ছেলে তিন মেয়ে এবং বৌ আর শালীকে নিয়ে তার প্রকাণ্ড সংসারের খরচ না

চলে, শ্রীমন্তসহায় কিছু কিছু সাহায্য করবে। আয়ের ভাগ ছাড়বে না এক পয়সা, কিন্তু সাহায্য করবে। ভাগের দশ গুণ দিতে হলেও সাহায্য করবে।

কারণ, ব্যবসাতে কে কার ভাগ্নে, কে কার মামা! মামা হয়ে খেতে পাচ্ছ না, ভাগ্নের সাহায্য নাও! দুবেলা আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকো সেই সাহায্য নিয়ে, ব্যবসাতে পাওনার বেশি আধলাটি পাবে না।

'রাজা হয়ে বেঁচে থাক বাবা!' বলে ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরে সেদিন, বছর চারেক আগে, কৃতজ্ঞতায় দণ্ডধারী কেঁদে ফেলেছিল। ডাক্তারীর আয়টা বেশ ভালো রকম হওয়ায় আজকাল বখরার ব্যবস্থা নিয়ে সে খুঁত খুঁত করে।

বলে, 'রুগী দেখার পয়সাতে তোর বখরা কিসের? তুই যাস্ রুগী দেখতে? তিন ক্রোশ পথ হেঁটে আমি দেখব রুগী—'

শ্রীমন্তসহায় বলে, 'সব রুগী আমার মামা। তুমি শুধু দেখতে গিয়ে ভিজিট নিয়ে এস।'

গোবর্ধনকে দুর্বোধ্য রহস্যের কথা শোনাতে শ্রীমন্তসহায় বড় ভালোবাসে। গোবর্ধন বোকা মানুষ, কিছু বোঝে না, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে কি যেন আঁচ করে সে বিহ্বল হয়ে যায়। সেই বিহ্বলতা স্পর্শ করে এদিক ওদিক সেদিক থেকে আঘাত পাওয়া শ্রীমন্তসহায়ের আঁকাবাঁকা মন। শ্রীমন্তসহায়ের মনগড়া দর্শন, আকাশ পৃথিবী সূর্যচন্দ্র তারায় জড়ানো তার আবেগ, জীবন মরণ সুখ দুঃখ ব্যথা বন্ধন মুক্তিকে আশ্রয় করা তার উদাস, মৃদু গম্ভীর গলার আওয়াজ সমস্ত মিলে গোবর্ধনের হৃদয়কে আকুলি ব্যাকুলি করিয়ে ছাড়ে।

আজ বাস-এর গোলমালে কেউ আসে নি। বুড়ো শশীধর শুধু অনেক তফাতে বসেছে—সে কিছু শোনে না, শুনতে পারে না। নটবরের বিধবা বোন মন্দিরে আলো জেলে রেখে গেছে, নটবর এক সময়ে এসে

ঘণ্টা নেড়ে দিয়ে যাবে। মন্দিরে আজকাল এক ছটাক চালও হয় না। একবেলা—চার পাঁচটা সরা দিলেও নয়। গোবর্ধনকে দেখে শ্রীমন্ত-সহায় ডাক দিল। কাছে গিয়ে গোবর্ধন বলল, 'বসবার সময় নেই গো নায়েক মশায়। বাস এলে কুমড়োটা বেচব।'

'কোথা তোর বাস? বোস। ভালো করে নজর রাখ দিকি গোবর্ধন, ঠিক কখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা লাগে বলতে হবে তোকে।'

'খিদে পেয়েছে নায়েক মশায়।'

'খিদে পেলেই খাস বুঝি তুই? রাজা মহারাজা হলি কবে থেকে? এ গাঁয়ে কেউ আর খিদে পেলে খায় না গোবর্ধন—তুই আর আমি ছাড়া। দুবেলা আধপেটা খাস? তবে তুইও বাদ গেলি। আমি চারবেলা খাই, পেট ভরে খাই, রাজভোগ খাই! বৌটা এলে সেও খাবে। সবার খিদে সয়, আমার কেন সয় না বলতো? খিদেয় আমার পেট জ্বলে না, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে।' শ্রীমন্তসহায় হাসল, 'যা বাবা, যা। গাঁয়ে আটক আছি, তাই না তোদের ডেকে দুটো কথা কই!'

সত্যই বড় খিদে পেয়েছিল গোবর্ধনের। কিছু না খেয়ে কুমড়োটা নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করা যাবে না, শেষ পর্যন্ত বাস হয়তো আসবে অনেক দেরিতে।

খাওয়ার তাগিদ শুনে কিন্তু তার বৌ গুণমতী মাথা নাড়ল—

'সন্ধে লাগুক, বাতিটে জ্বালি? সবুর কর খানিক।'

'মুড়ি দে দুটি?'

'কাণ্ডজ্ঞানটি খুইয়েছো একদম। বাতিটে জ্বালি? আগে এসতে পারলে নিকো একটুকু?'

'বাতি জ্বাল।'

'সন্ধে হোক?'

গোবর্ধনকে সায় দিতে হল। সন্ধ্যাকে হতে না দিয়ে সত্যই এখন আর

'বাতি জ্বালা যায় না। দিন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা এখনো হয় নি। অথচ ইচ্ছে করলেই সে অনেক আগেই বাড়ি ফিরতে পারত। বাস আসে নি, আসতে দেরি হবে শুনেই সোজা বাড়ি চলে এলেই হত। কিন্তু কোনো একটা ব্যাপার বুঝে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে যেন তার জন্ম কেটে যায়। তাড়াতাড়ি করার তাগিদ বোধ করেও সে ঢিমে তালে কাজ করে যায় চিরদিন—শ্রীমন্তসহায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে যাবার বদলে দাঁড়িয়ে খানিক আলাপ করে আসে। এমনি করে সব তার পণ্ড হয়ে গেল—সব। মনটা খিঁচড়ে যায় গোবর্ধনের। সে ভাবে, কুমড়ো নিয়ে যেতে যেতে বাসটা এসে চলে যাবে নিশ্চয়, চিরদিন এমনি ঘটনাই তো ঘটে এসেছে তার জীবনে! নাঃ, খিদে মেটাবার জন্ম দুদণ্ডও সে দাঁড়াবে না বাড়িতে।

ছেলের হাতে রাস্তায় দুটি মুড়ি পাঠিয়ে দিতে বলে কুমড়োটি সে বার করতে যাবে, গুণমতী তাতেও বাধা দিল। বাতি জ্বালার আগে ঘর থেকে এখন কুটোটি সে বার করতে দেবে না।

'ধুত্তোর বাতি জ্বালা!' পনের সের ওজনের মস্ত কুমড়োটি কাঁধে তুলে গোবর্ধন বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে গুণমতী কাতর হয়ে বলল, 'ওগো, যেওনি তুমি, যেওনি। কেউ কুমড়ো কিনবে নি তুমার, সবুর করে যাও।'

গুণমতীর শরীর ছিপছিপে, গলাও বাঁশির মতো সরু। কাতর হলে ভারী মিহি আর মিষ্টি শোনায়। পেটের জ্বালায় কাতর হয়ে না থাকলে গোবর্ধন হয়তো রাগও করত না, কুমড়ো নিয়ে অসময়ে ঘরের বাইরে যাবার সাহসও খুঁজে পেত না।

'কিনবে নি তো কিনবে নি। নালায় ফিঁকে দিয়ে চলে এসব।'

এই বলে কাঁধের নিটোল কুমড়োটি বাগিয়ে ধরতে গিয়ে গোবর্ধনের হাত পড়ল গর্তে। অঙ্গনে নামিয়ে রেখে সে তাকিয়ে রইল কুমড়োটির

দিকে। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চার আঙুল চওড়া একটি ফালি কুমড়ো থেকে কে কেটে নিয়েছে।

এক চড়েই গুণমতী কেঁদে ফেলল—ডুকরে নয় ফোঁস ফোঁসিয়ে। শুধু কাঁদল না, বিনিয়ে বিনিয়ে নিজের পক্ষ সমর্থনও করে চলল সেই সঙ্গে। গোবর্ধন যে বলেছিল কুমড়োটা সে বেচবে না! লোকের কিপ্টেপণাকে গাল দিতে দিতে জোর গলায় সে যে বলেছিল কুমড়োটা ঘরে পচাবে তবু বেচবে না! তাই শুনে গুণমতী যদি এক ফালি কেটেই নিয়ে থাকে আর রাণীকে এক রত্তি একটু দিয়ে, তরকারী রেঁধে থাকে গোবর্ধনের জন্ম, কি এমন ঘাটতি হয়েছে তার যে তাকে চড় মারবে গোবর্ধন!

গোবর্ধন কুমড়ো নিয়ে বেরিয়ে যাবার পরেই তার কান্না থেমে গেল। কান্না যে শেষ হয়ে গেল তা নয়, তোলা রইল। গোবর্ধন ফিরে এলে, ঘর সংসারের সব কাজ চুকে গেলে গোবর্ধনের তামাক টানা শেষ হলে সময় বুঝে সে আবার একটু কাঁদবে। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে নিজের মনে নিজের অদৃষ্টকে গাল দিয়ে দুকথা বলতে আরম্ভ করলেই বুকে ঠেলে তার কান্না আসবে।

গোবর্ধন বলবে, ইদিকে আয় নাদুর মা।

সে ফুঁপিয়ে বলবে, ন্যাকামি কোরোনি বলছি, ভাল হবেনি কিন্তু হাঁ!

গোবর্দ্ধন আরও নরম হয়ে তাকে সাধবে। তারপর—

কিন্তু যেমন সে ভাবছে তেমন ঘটবে কি—তাদের চিরদিনের রাগ সোহাগের এক ঘটনা? শরীরটা তার শুকিয়ে গেছে ঢের, ঘুমের মতো কেমন একটা ঝিম ধরা ভাব সদাই যেন জড়িয়ে ধরে আছে। গোবর্ধনও কেমন হয়ে গেছে, অসহায়ের মতো কেমন দিশেহারা ভাবে চায়। আহা, পাঁজরাগুলো বেরিয়ে গেছে জোয়ান মানুষটার।

কোথা থেকে রাণী এসে বলল, 'মিনষে বড় গোঁয়ার দিদি, নয়? কী চড়টা মারলে!'

গুণমতী চটে বলল, 'তোর মুখ বড় মন্দ রাণী। সোয়ামি দিতে চায় না, তুই কি করে জানবি সোহাগ কেমন ধারা হয়।'

বন্ধুর বিরাগে থতমত খেয়ে রাণী বলল, 'মারলে নাকি সোহাগ হয়!'

গুণমতী মুচকে হাসল।—'মারলে? মারবে কেনে লো বোকা ছুঁড়ি। গালটা টিপে দিয়েছে এমনি করে।'

গুণমতীর গাল টিপুনিতে বড় ব্যথা লাগল রাণীর, টনটনে ব্যথা। গুণমতীর ভাব দেখে যে কথা চেপে যাবে ভেবেছিল, সে কথাটা না বলে সে থাকতে পারল না, 'অত কান্না হচ্ছিল কেনে শুনি তবে?'

'ওমা! সোয়ামির সোহাগে কান্না এসছেনি?'

নিতাই সাহার বাসনের দোকানের সামনে ছোট রোয়াকটির এক পাশে কুমড়োটি নামিয়ে গোবর্ধন বাস আর ছেলের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। গুণমতী সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বাললেই নান্থু তার মুড়ি আর গুড় নিয়ে আসবে। কি ভয়ানক খিদে তার পেয়েছে জেনে নান্থুকে পাঠাতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না গুণমতী।

চারিদিকে অন্ধকার হয়ে আসে। কদিন আগে পূর্ণিমা গেছে, চাঁদ আজ উঠবে একটু দেরিতে। দোকানগুলিতে একে একে আলো জ্বলে ওঠে, —লণ্ঠন, প্রদীপ আর কুপি।

নিতাই সাহা আনমনেই শুধোয়, 'চোদ্দ পয়সায় দিবি? আধখানা ত কেটেই লিয়েছিস।'

গোবর্ধন সংক্ষেপে বলে, 'না।'

বাস সম্বন্ধে সকলের মনে একটু হতাশা দেখা দিয়েছে। এখন বাস এলেও বেশিক্ষণ থামবে না, আরোহীরা ঘুরে ফিরে দরদস্তুর করে সদরের চেয়ে সস্তায় কিছু কিনতে সময় পাবে না। তারা খিদে আর চায়ের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে থাকবে, চা আর খাবার খাওয়া ছাড়া কোনো দিকে নজর দেবার অবকাশ কি তারা পাবে! গোবর্ধনের রাগ

পর্দায় পর্দায় চড়তে থাকে। একটা চড়, শুধু একটা চড়ের জন্ত গুণমতী তাকে দুটি মুড়ি পাঠাল না? রাগটা মনের মধ্যে পাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত প্রায় অভিমানেই দাঁড়িয়ে যায় গোবর্ধনের। রাগের মতো অভিমানও শাস্তি দিতে চায় কি না, তাই বাড়ি ফিরে আরও কয়েকটা চড়চাপড় বসিয়ে দেবার বদলে না খেয়ে থেকে গুণমতীকে শাস্তি দেবার কল্পনায় সে বিশেষ কোনো তফাৎ খুঁজে পায় না। তাছাড়া তার অভিজ্ঞতা আছে। চড়চাপড়ের চেয়ে শেষের শাস্তিটাই জোরালো হয়। চড় মারলে গুণমতী শুধু কাঁদে, রাগ করে উপোস দিলে মাথা কপাল খুঁড়তে আরম্ভ করে।

গোবর্ধন ভাবে, জগতের কাছে দুপয়সায় চা খেয়ে চাঙা হওয়া যাক। ছ সাত মাস আগে কারা যেন এসে চায়ের আশ্চর্য গুণের কথা তাদের জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর দুএকবার খিদের সময়—মাঠে খাটবার সময় যে খিদে শরীর ভেঙ্গে আনে আর মাথা ঝিম ঝিম করায় —মুড়ি চিড়ার বদলে কাঁচের গ্লাসে চা খেয়ে দেখেছে। মন্ত্রবলে যেন খিদে মরে যায়, সারা দেহ চাঙা হয়ে ওঠে। কেবল একটা আক্ষেপ থেকে যায়—তৃষ্ণার। মনে হয়, সমস্ত শরীর, সমস্ত শরীরের ভেতরটা যেন হাত-পা আছড়ে মূর্ছা যাচ্ছে! আধ ঘটি জল খেয়ে একটু বিশ্রাম করলেই সেটা সেরে যায়। অনেকক্ষণ খিদে পায় না, সর্বনেশে খিদে!

জগতকে গোবর্ধন দুধ জোগায়, দেনা-পাওনার হিসেব আছে। চাইতেই চা পাওয়া গেল, আর এক পয়সার ছোলাভাজা। একদিকে কাঁচবসানো টিনের পাত্রে নোন্তা মিষ্টি বিস্কুটগুলি চিরদিন গোবর্ধনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিস্কুট তার কপালে জোটে না। কয়েকবার একখানা করে কিনেছিল, খেতে পারেনি। নান্নু রোজ বিস্কুটের পয়সার জন্ত বায়না ধরে, কাঁদে। নিজের জন্ত বিস্কুট কিনে কোণা ভেঙ্গে একটু শুধু স্বাদ গ্রহণ করে নান্নুর জন্ত তুলে রাখতে গোবর্ধন কোনোদিন

এতটুকু মজা পায় না, তবু তার কেনা বিস্কুট শেষ পর্যন্ত নাম্বুর পেটেই যায়। তার একগাল হাসি আর ভাবভঙ্গির খুশি খুশি ভাবটা জগৎ-সংসারের ওপর গোবর্ধনকে চটিয়ে দেয়। একবার সে ছুখানা বিস্কুট কিনেছিল একসঙ্গে, ভাগ্যকে প্ররাস্ত করবে বলে। কিন্তু হায়রে কপাল গোবর্ধনের, বিস্কুট সম্পর্কে যার কথা কোনো দিন তার মনে আসেনি, সেদিন তারই কথা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল—গুণমতী বোধ হয় জীবনে কখনো বিস্কুটের স্বাদ পায়নি!

কত দিক থেকে এমনি ধারা কত চাপ যে ঠেসে ধরে রেখেছে গোবর্ধনের মনকে! আজকের মতো যাতনাময় ক্ষুধায়, প্রতিদিনের অপরিতৃপ্ত ক্ষুধায়, সেই চাপগুলি সে স্পষ্ট অনুভব করে। বহুক্ষণ নিঃসঙ্গ থাকলে তার যখন ঝিম ধরে যায় তখন মনে হয়, পায়ের তলার শক্ত মাটি ছেড়ে খানিকটা উপরে উঠে সে যেন নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে, দড়াম করে পড়ল বলে।

গোবর্ধনের অনেক আগে থেকে জলভরা বালতি নিয়ে অপেক্ষা করছে নিবারণ। তার অপেক্ষা করাটা যেন ছটফটানোর সামিল। হঠাৎ উঠে ঘর চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে দশ পনের মিনিটের মধ্যে। বাড়িতে তার একমাত্র বোনটি ছাড়া সকলের অসুখ। বৌ ছেলে আর ভায়ের গা-হাত-পা ফুলে জর হয়েছে, দণ্ডধারী দেখে বলেছে যে এটা ভালো চাল একদম না খাওয়া আর খারাপ চাল একটুখানি করে খাওয়ার ফল। অনাহারের বদলে খাঁটি সজী আর ফ্যানের বদলে দুটি ভাত খেলেই সেরে যাবে। বুড়ী ঠাকুমার বয়সের ব্যারামটা হঠাৎ খারাপের দিকে চলতে শুরু করেছে। ঠাকুমা মরবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরেক-জন কাউকে সে পাছে সঙ্গে নিয়ে যায়, এই হয়েছে নিবারণের ভয়। বারবার সে তাই ঘরে ছুটে যাচ্ছে। আবার এদিকে বাসের ড্রাইভার তার জন্ম সের তিনেক চাল আনবে, ঘরেও তার তাই মন টিকছে না।

নইলে, বালতিভরা জল রয়েছে, একটা দিন কি তার হাজির না থাকলে চলে না!

'তোমার কি দাদা, যখন খুশি কুমড়োটি লিয়ে ঘর যাবে। মোকে ঠায় বসি থাকতি হবে যত খন না শালার বাস এসে।'

'এসবে! ইবারে এসবে।'

কিন্তু বাস আসে না। রাত বেড়ে চলে। গাঁয়ে কখন রাত দুপুর হয় বাসের কি জানা নেই? আলাপ বিলাপের শব্দ চারিদিকে ঝিমিয়ে আসে। দুএকটি দোকান বন্ধ হয়ে যায়, অসময়ের বাসের সঙ্গে এদের স্বার্থ তেমনভাবে জড়িত নয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে নিবারণের মাথাটা ধীরে ধীরে বুকে নেমে আসে এবং তার গলায় শুরু হয় শ্লেষ্মার একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড় আওয়াজ। গোবর্ধনেরও ঘুম পায়। শ্রীধন বলে, 'অ গবর্ধন, এ যে খিদে পেয়ে গেল দস্তুরমত। বাড়ি থেকে চট করে খাওয়াটা সেরে আসি। বাস যদি এসে পড়ে, ড্রাইভারকে এই চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে একটু দাঁড়াতে বলিস বাবা।'

'আজ্ঞে, বলব।'

'শব্দ শুনেই ছুটে আসব। তবে কি জানিস, মোটাসোটা মানুষ অত ছুটতে পারিনে।'

শ্রীধন মাইতি চলে গেলে গোবর্ধন ঝিমোতে ঝিমোতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ কানের কাছে একটা উৎকট সোরগোলে সে সজাগ হয়ে ওঠে। আরেকটু পরে সে ভালো করে ঘুমিয়ে পড়ার পর সোরগোলটা আরম্ভ হলে গোবর্ধন নিশ্চয় দাওয়া থেকে নিচে পড়ে যেতো।

কুকুরের লড়াই।

গজেনের খাবারের দোকানের সামনে দুটো কুকুর সর্বদা পড়ে থাকে—তিনকু আর ভুলি। বাস তারা করে গজেনের বাড়িতেই, গজেন দোকান খুলতে এলে সঙ্গে আসে, আবার দোকান বন্ধ হলে গজেনের

সঙ্গে ফিরে যায়। কেবল দোকানের ফেলনা ঘিয়ের খাবার খেয়েই বেঁচে থাকে না বলে দুজনের সব লোম খসে যায়নি, ঘন লোম একটু পাতলা হয়েছে আর দুএকটা ছোটখাট টাক পড়েছে এখানে ওখানে। তিনকুর চেহারা বেশ জমকালো, গম্ভীর গোমড়া মুখ, মাঝবয়সী জোয়ান মদ্দ কুকুর। তার কাছে রোগা ছোটখাটো ভুলিকে কেমন বেমানান দেখায়। বয়সে কিন্তু ভুলি তিনকুর চেয়ে বড়ই হবে। তেজ কিন্তু তার কম নয়, মাঝে মাঝে তার দাঁতখিঁচুনিতেই তিনকুকে বিনা প্রতিবাদে তফাতে সরে যেতে দেখা যায়।

গত বছর পাঁচটি বাচ্চা হয়েছিল। শরীরটা ভালো ছিল না ভুলির, পাঁচটিকে বাঁচাতে পারবে না জেনে দুটিকে বেছে নিয়ে মাই না দিয়ে নিজেই সে মেরে ফেলেছিল। একটি খেয়েছিল শেয়ালে, একটি মরেছিল দুর্বোধ্য রোগে এবং অন্যটিকে চেয়ে নিয়ে নামু গলায় দড়ি বেঁধে টেনে টেনে বেড়িয়েই শেষ করে দিয়েছিল। বর্ষা ঋতুর আসন্ন আবির্ভাব ওদের দুজনকেই একটু চঞ্চল ও জীবন্ত করে তুলেছে। দোকানের সামনে চুপচাপ পড়ে থেকে সারাক্ষণ ওরা শুধু জিভ বার করে হাঁপায় না। খানিক আগেও গোবর্ধন ওদের ছুটোছুটি লাফালাফির খেলা দেখেছে, লড়ায়ের অভিনয়ে ভুলির আদরের কামড়ে তিনকুকে হার মেনে শূন্যে চার পা তুলে চিৎ হয়ে পড়তে দেখেছে।

গোবর্ধনের কালোও যে বর্ষা ঋতুর তাগিদে বসন্ত-ব্যাকুল মানুষের মতো চঞ্চল হয়ে সঙ্গিনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে, কে তা জানত! তিনকুর সঙ্গে তার বেধেছে লড়াই এবং দুজনকে ঘিরে চারিদিকে পাক দিতে দিতে তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার জুড়েছে ভুলি। তিন দফা লড়ায়ের পর কালোকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে গোবর্ধনের মনটা বিগড়ে গেল। কালোর সম্বন্ধে সে একান্ত উদাসীন, তার আস্তাকুঁড় ঘেঁটে আর মাটির খোলায় গুণমতীর দেওয়া একমুঠো ভাত খেয়ে কালো বেঁচে

থাকে আর উঠানের কাঁঠাল গাছটার নিচে সারাদিন বিশ্রাম করে। রাত্রে হয়তো দাওয়ায় উঠে শোয়, কেউ টের পায় না। লেজ নাড়তে নাড়তে কখনো কাছে এলে গোবর্ধন তাকে দূর দূর করে তাগিয়েই দিয়েছে চিরদিন। তবু আজ কালোর পরাজয়ে কেমন একটা অপমান বোধ ভেতরে কামড়াতে থাকে। গজেনের লোম ওঠা বুড়ো কুকুরের কাছে তার চিকন কালো কুকুর হেরে গেল!

তারপর আর তো ঘুম আসে না গোবর্ধনের! জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষোভ আর নালিশ যেন একসঙ্গে পাক দিয়ে উঠে তার কণ্ঠ রোধ করে দিতে চায়। সেও প্রায় জগতের ছোট-বড় আপন-পর সকলের জিদের কাছে এতকাল হার মেনেছে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কুঁকড়ে দিয়েছে সবাই মিলে। অপরাজেয় বিরাট দৈত্যের মতো একটা অদৃশ্য শত্রুর সান্নিধ্য গোবর্ধন স্পষ্ট অনুভব করে।

এদিকে ততক্ষণে সুরু হয়েছে ওষুধের দোকানে মানুষের লড়াই। দণ্ডধারী ও শ্রীমন্তসহায়ের দৈনন্দিন কথা কাটাকাটি আজ প্রচণ্ড কলহে পরিণত হয়েছে। শ্রীমন্তসহায় চিরদিন কড়া কথাও আস্তে বলে, গলা চড়ায় না। গলা ছেড়ে আজ সে মামাকে গাল দিচ্ছে শুনে গোবর্ধন আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর যে কাণ্ড করল শ্রীমন্তসহায়, দেখে শুনে তাক লেগে গেল গোবর্ধনের। গর্জন করতে করতে দণ্ডধারীকে টেনে হিঁচড়ে দোকানের বাইরে এনে সজোরে এক ধাক্কা দিল। দণ্ডধারী একেবারে আছড়ে পড়ল বাঁধান পাথুরে রাস্তার ধুলোয়।

আলো নিভিয়ে দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে শ্রীমন্তসহায় বলল, 'আর ঢুকো না মোর দোকানে তুমি। যেখানে খুশি ডাক্তারী করে বড়লোক হওগে যাও। একটি পয়সা ভাগ চাইব না।'

দণ্ডধারী তখনও রাস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নি। সামনে পা ছড়িয়ে দুপাশে রাস্তায় দুহাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে সে বোধ হয় রাগ

আর ব্যথা সামলে নিচ্ছিল। ক্রুদ্ধ আর্তনাদের মতো উদ্ভট সুরে সে জবাব দিল, 'মারলি! গুরুজনকে মারলি! সর্বনাশ হবে তোর, ঘরে তোর মড়ক লাগবে। তখন যদি পায়ে ধরে এসে কাঁদিস, মাথা কপাল কুটিস চিকিচ্ছের জন্যে—তুই মরবি, মা ছেতলার কিরপা হয়ে একুশ দিন ভুগে মরবি।'

এতক্ষণে সকলে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পুবে সদ্যোদিত ম্লান নিষ্প্রভ চাঁদের আবছা আলোয় দণ্ডধারীকে রাস্তায় পড়ে তীক্ষ্ণ চড়া কান্নার সুরে অভিশাপ দিতে শুনে দুচারজনে শিউরে উঠল। এ বছর চারিদিকে বেশ ভালো করেই বসন্ত রোগের আবির্ভাব ঘটেছিল, এখন একটু নরম পড়েছে। দণ্ডধারীর অভিশাপ হয়তো ফলেই যাবে! গাঁয়ের এক প্রান্তে একটু তফাতে ফচ্‌কের মাসী এই রোগে সেদিন চিতায় উঠেছে—ফচ্‌কে আর শ্রীমন্তসহায় শুধু দুজনের কাঁধে একটা বাঁশে বাঁধা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে উঠেছে চিতায়। শ্রীমন্তসহায় কত ছোঁয়াছুঁয়ি করেছিল ফচ্‌কের মাসীকে! তার অবশ্যম্ভাবী ফলটা গুরুজনের অভিশাপের তাগিদে দু-চার দিনের মধ্যেই নির্ঘাৎ ফলে যাবে নিশ্চয়।

শ্রীমন্তসহায় এগিয়ে এসে বলল, 'বড্ড লেগেছে নাকি মামা? ওঠ, বাড়ি যাও।'

ধীরে ধীরে দণ্ডধারীকে ধরে তুলে সে দাঁড় করিয়ে দিল। এ কাজটা এতক্ষণ অন্য কারুর করাই উচিত ছিল বটে, কিন্তু উচিত কাজ কি সব সময় করতে পারে মানুষে? শ্রীমন্তসহায় রাগ করতে পারে এ ভয়তো ছিলই, তাছাড়া একটু শুধু অপেক্ষা করছিল সকলে, তারপর কি ঘটে দেখবার জন্য। মামাকে যে ঘাড় ধরে রাস্তায় আছড়ে ফেলতে পারে, অভিশাপ শুনে তার পক্ষে তেড়ে এসে আরও দু চার ঘা বসিয়ে দেওয়া বিচিত্র কি।

শ্রীমন্তসহায়ের নতুন ধরনের কথা ও ব্যবহারে দণ্ডধারীও একটু ভড়কে

গিয়েছিল। হাত ছাড়িয়ে হন হন করে খানিকটা তফাতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে ভাগ্নেকে পাজী, বজ্জাত, বেজন্মা, চণ্ডাল প্রভৃতি কতগুলি বাছা বাছা গাল শুনিয়ে গাল দিতে দিতেই আবার হন হন করে কাঁচা পথে নেমে বাড়ির দিকে চলে গেল।

শ্রীমন্তমহাঁয় সকলকে শুনিয়ে বলল, 'চারটে গাঁ ঘুরে আজ চার টাকা পেয়েছে। কাল পেইছিল দেড় টাকা। বললাম, কালকের বার-গণ্ডা পয়সা যদি না দিলে তো নাই দিলে মামা, আজকের দুটো টাকা দাও? বলে কিনা, মোর পাওনা নেই!—বাপের শালা কুথাকার! দূর করে দিলাম দোকান থেকে। কদ্দিন ভণ্ডামি সয় বলো? ওটা কি ডাক্তার? আমি একটা চটি বই কিনে দিইছি, তাই পড়ে ডাক্তারি করে, আবার আমারি মুখের পরে চোটপাট। পাওনা নেই! মোর সব কিছু —মোর পাওনা নেই!'

চায়ের দোকানে গিয়ে সে লোহার চেয়ারটা দখল করে বসল, হাঁক দিয়ে বলল, 'এক কাপ চা দে দিকি বাবা কে আছিস। দুধ মিষ্টি দিস্ বাবা একটুখানি, তেতো না লাগে।'

ধীরে সুস্থে চা পান করে বিড়ির বদলে এক পয়সার একটা সিগারেট কিনে সবে সে ধরিয়েছে, দূরে দেখা গেল বাসের আলো। বাসেরই আলো। মোটর গাড়ির আলো আরও নিচে থাকে।

গোবর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে কুমড়োটা তুলে নিল কাঁধে আর নিবারণ গিয়ে দাঁড়াল তার জলভরা বালতির কাছে। জগত চা-ভরা পাত্রটি উনানে তুলে দিল আর দোকানের ঘুমন্ত ছোকরাটাকে এক গাঁট্টায় জাগিয়ে দিল আধো কান্নায়। কয়েকটি মিট মিটে আলোজ্বালা শুব্ধ ঘুমন্ত পুরী যেন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলার মতো লোক নেই, বহুলোক চলে গেছে, কিন্তু অবশিষ্ট কয়েকজনের অতিরিক্ত উত্তেজনা সে অভাব পূরণ করে দিল।

বাসের দৃষ্টিগোচর চোখের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্তসহায় তখন অনিচ্ছুক শ্রোতা গোবর্ধনকে বলছে, 'গাঁ থেকে বেরুতে পারি না, তাই না শ্বশুরের এত জোর! পাঁচ দিন আগে পৌঁছে দিয়ে যাবার কথা, আজও এল না। তাই না বলছিলাম মামাকে, আজকের বাসে এলো তো এলো, না এলে কাল তুমি গিয়ে নিয়ে এসবে। তা মামা বলে, উঁহু, সেটা নিয়ম নয়। মামাশ্বশুর একলাটি ভাগ্নে বৌকে নিয়ে এসবে কি করে, মামাশ্বশুরের ছায়া দেখতে নেই ভাগ্নে-বৌয়ের? শুনলি? এমনি করে রসাতলে যাচ্ছে দেশটা। একবারটি এসে নিক। কি করব জানিস? একটা গোটা দিন রাত বৌ আর মামাটাকে এক ঘরে কুলুপ দিয়ে রেখে দেব।'

সর্বাঙ্গে আওয়াজ করতে করতে পুরানো বাস এসে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত যাত্রীরা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল চা ও খাবারের দোকানে। ড্রাইভার ঈশ্বর এবং ক্লিনার ও কণ্ডাক্টর পটল পর্যন্ত নেমে গেল চা খেতে।

নিবারণ গাড়িতে জল দিতে গিয়েছে, ঈশ্বর চেঁচিয়ে বলল, 'আরে ও নিবারণ, জল দিস্ নি।'

নিবারণ বিস্মিত হল, প্রতিবাদ করল না। কাছে গিয়ে বলল, 'চাল কটা দেন ঈশ্বরবাবু, ঘর গিয়ে ছুটি রাঁধি।'

'মোদের জন্মে রাঁধবি না?' ঈশ্বর নির্বিকারচিত্তে হাসল, 'না, তোর ঘরে আবার রুগী সব কটা। চাল কিন্তু মোটে দেড়সের মিলেছে ভাই।'

মৃত্যুর নিমীলনের বদলে জীবনের বিস্ফোরণে দুচোখ প্রায় গোলাকার হল নিবারণের, সে বলল, 'দেড় সের?'

'দাম চড়ে গেছে ভাই।' চায়ে চুমুক দিয়ে ঈশ্বর গলা নামাল, 'বাবুকে বলেছি, সেন সাহেবকে ধরে কিছু চাল সস্তায় পাইয়ে দিতে। পেলে পাঁচ দশ সের দেব তোকে।'

এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রীধন মাইতি এসে পড়ল। বাস একেবারে

খালি দেখে বিস্ময় ও আনন্দে তার ভরা পেট মোচড় দিয়ে উঠল। এভাবে বাস খালি করে এক সঙ্গে নেমে যায় না যেয়ে পুরুষ সবাই, তবে নেমেছে যখন ও বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে জায়গা দখল করে নিয়ে আরাম করে বসাই ভালো।

ঈশ্বর চায়ের দোকান থেকে হাঁক দিয়ে বলল, 'আরে ও মশায়! ওটা করছেন কি? বাস আজ যাবে নি।'

'যাবে নি কি হে? এলো তো যাবে নি কেনে?'

'বাসের গোসা হয়েছে। এক পা নড়বে নি।'

'আমার সাথে ফাজলামি করবি নি তুই বেয়াদব কুথাকার।'

ঈশ্বর নির্বিকারচিত্তে দুহাত দুদিকে কাত করে উদাসভাবে বলল, 'তবে চালিয়ে নিয়ে যান আপনি। বাজারের মোড়ে নিয়ে যাবেন। বাবু খুশি হবে।'

এবার উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে শ্রীধনকে নামতে হল। কাল তার মোকদ্দমা সদরে, দেরি করে বাস যদিবা এলো, সে বাস যাবে না! গোবর্ধন এদিক ওদিক কুমড়ো বিক্রীর চেষ্টায় ঘুরছিল। কিন্তু এত রাত্রে এ অবস্থায় কুমড়োর দিকে তার তাকাবে কে! বাস ভর্তি লোক এখানে আজ আটকে পড়েছে, কোথায় খাবে কোথায় শোবে কি করবে কিছুই তারা জানে না। তবে শুধু এইটুকু ভরসা যে, যেমন হোক একটা গ্রামে এসে বাসটা থেমেছে। মুড়ি চিড়ে খাবার টাবার কিছু খেয়ে আশ্রয় চাইলে কেউ অস্বীকার করবে না। মাথা গুঁজে রাতটা কাটাবার জায়গা সবাই দেবে।

শ্রীধন গোবর্ধনকে শুধোল, 'বাস যাবে না কেনরে?'

'কি বিগড়েছে কে জানে।'

শ্রীধন চায়ের দোকানে এগিয়ে গেল। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, 'তুমি ঈশ্বর ড্রাইভার না?'

ঈশ্বর তাকে চিনেছিল অনেকক্ষণ। দেহখানি দূর থেকে দেখলেই শ্রীধনকে চেনা যায়। এতক্ষণে ভদ্রতা করে বলল, 'মাইতি মশায় যে! আমি ভাবলাম, কে না কে হবে, গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে। বসেন মাইতি মশায়, বসেন।'

'বাস নিয়ে যাবে না কেন হে? অ্যাদ্দুর এসে এখানে বাসটা ফেলে রাখা—'

'আজ্ঞে তেল নেই এক ফোঁটা।'

এখানকার কেউ তো জানতই না বাস কেন খড়পায় এসে আটকে গেল, যাত্রীরাও অনেকেই ভালো করে জানত না। সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কারণটা ঈশ্বরের মুখে শুনল। সেন সাহেবের তেল কম পড়ায় দু গ্যালন তেল ধার চেয়েছিলেন। সেন সাহেবের ড্রাইভার বাসের তেল পাম্প করে সাহেবের গাড়ি চালান দিতে লাগল, সেন সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে। 'সব নিয়ো না হে!' সেন সাহেব বল্লেন।

'না, হুজুর। বহুত তেল হ্যায়।' বল্লে তাঁর ড্রাইভার।

গাড়ির ইঞ্জিন তখন মেরামত হচ্ছে। ঈশ্বর কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়েছিল তেল চালানের কাছে। পাম্পে যখন আর তেল ওঠে না, তখন দু গ্যালন তেল ধার নেওয়া শেষ হল।

'তুমি কিছু বললে না সাহেবকে? বললেই তিনি সদর পর্যন্ত পৌঁছবার তেল নিশ্চয় ফেরত দিতেন। বাসভরা এতগুলো লোক—'

ঈশ্বর মাথাটা কাত করে প্রায় ঘাড়ে ঠেকিয়ে সায় দিল, 'বল্লে, দিত। একবার ভেবেছিলাম বলি। বাবুর কথা ভেবে সামলে গেলাম। দোষ আমারই কি না। আলগা টিনে তিন চার গ্যালন তেল মোদের রাখতে হয়। একটা টিনে খানিকটা তেল মোটে ছিল। বাবুকে বলতে হবে, টিনের তেলও সাহেব নিয়েছেন।'

একজন বলল, 'সাহেব যদি না বলে?'

ঈশ্বর অবাক হয়ে বক্তার নিরীহ গোবেচারী মুখখানার দিকে খানিক চেয়ে বলল, 'সাহেব না বলবে! কে জিজ্ঞেস করতে যাবে সাহেবকে? এ কি আদালত পেয়েছো না কি? বাবু যখন বিশ বস্তার জায়গায় ছশো বস্তা চাল গায়েব করবে, সাহেব কি তখন শুধোতে যাবে, না কাউকে শুধোতে দেবে?'

শ্রীধন আগাগোড়া ঠোঁট কামড়ে বিরক্তি জানিয়ে ইসারা করছিল, ঈশ্বর থামল না দেখে এবার রুক্ষস্বরে বলল, 'এসব কথা যে ফাঁকা করে বেড়াচ্ছ ঈশ্বর—'

'বাবুর হুকুম আছে।'

'হেঁ?'

'আরে বাবা, সোজা কথা বোঝা না কেউ? সেন সাহেব বড় ঠ্যাটা। বাবু ওকে সরাঁতে চান।'

শ্রীমন্তসহায় একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়াল।

'মশায়রা, দয়া করে আমার দুটো কথা শুনুন। আমার কিছু বলার হুকুম নেই। মুখ একদম সিল্ করা। তবে কিনা এ অবস্থায় দুটো কথা না বলে কি থাকতে পারি? মোদের গাঁয়ে এসে আপনারা আটক পড়েছেন। অতিথি হয়ে পড়েছেন আমাদের। তা আগের দিনের মতো অতিথি সৎকারের সাধ্য গাঁয়ের নেই, আপনারা সব জানেন। গাঁ থেকে দুটি খিচুড়ি রেঁধে দিলে কি গ্রহণ করবেন? ঘরে ঘরে ভাগ হয়ে তারপর রাতটা আপনারা একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দেবেন। আমার ঘর খালি— একদম খালি। কেউ নেই আমার বাড়িতে। সাত আটজন আমার বাড়িতেই থাকতে পারবেন।'

ঈশ্বর ব্যঙ্গ করে শুধোল, 'আপনার গাঁয়ে কত চালডাল আছে মশায়?' চেয়ার থেকে নেমে শ্রীমন্তসহায় সোজা ঈশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘুঁষি মারার জন্য ডান হাতের মুষ্টি তার তৈরি হয়ে আছে। ঈশ্বরের

ব্যঙ্গকে ভেংচি দিয়ে সে বলল, 'তোমার তা দিয়ে দরকার কি মশায়?'
ঈশ্বরও উঠে দাঁড়াল। মুষ্টি বাগিয়ে বলল, 'দরকার আছে বৈকি! তুমি তো গাঁয়ের দশটা বাড়ির চাল ডাল নিয়ে এতগুণো লোককে ভোজ দেবে—কাল উনানে হাঁড়ি চড়বে না দশটা বাড়িতে। আমি মুফতে চাল ডাল জোগাড় করে দেব। বুঝলে মশায় দরকারটা এতক্ষণে?'
'কে দেবে মুফতে চাল ডাল?'
ঈশ্বর ধনেশ সাহাকে সম্বোধন করে বলল, 'সা-মশায় দরকার মতো চাল ডালটা আপনিই দেন আজকের মতো।'
ধনেশ কিছু বলার আগেই শ্রীমন্তসহায় মাথা নেড়ে বলল, 'না মশায়, খাতিরের চাল ডাল আমরা খাইনে। পরিবার এসবে বলে কিছু চাল রেখেছি ঘরে, তা পরিবার এখন এসবে নি। আমার ঘরের চাল ডালেই ঢের হবে। খিচুড়ি হবে আর কুমড়ো ভাজা হবে। দেতো তোর কুমড়োটা গোবর্ধন—'
গোবর্ধনের হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল—পনের সেরি কুমড়োর ভার এতখানি সময়ে বড় সহজ দাঁড়ায় না। শ্রীমন্ত টানতেই কুমড়োটা মাটিতে পড়ে কয়েকটা খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল।
শ্রীমন্তসহায় যেন আরও উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বাপ্, এ যে বিরাট কুমড়ো তোমার গোবর্ধন! যাক যাক ওটাতো কাটতেই হত। একটা ঝোড়ায় তুলে ঘরে দিয়ে আয় দিকি পঞ্চু। তোমাকে দেড়সের—আচ্ছা, দুসের চাল দেব গোবর্ধন—কুমোড়োটার দাম।'
ঈশ্বর মুচকে হেসে বলল, 'আপনি মহৎ লোক মশায়, তাতে সন্দ নেই। ঠকিয়ে যারা প্রাণে মারছে তাদের ঠেঁয়ে দুটি চাল বাগিয়ে নিতে অভিমানে আপনার মরণ হয়।'
ধনেশ সাহা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, 'কার কথা বলছ? কে ঠকায়? কারা প্রাণে মারছে শুনি?'

জবাব না দিয়ে ঈশ্বর বাসটি রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখতে গেল। ওষুধের দোকানের পাশে রাস্তার সঙ্গে সমতল খানিকটা জায়গা ছিল। পটল হাতল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়ে সরে যেতেই ঈশ্বর বাস চালিয়ে দিল, পরক্ষণে তীক্ষ্ণ আর্তনাদে খড়পার আকাশ গেল চিরে। দুটি প্রাণীর আর্তনাদ। গোবর্ধনের কালো একবার আর্তনাদ করেই সামনের চাকায় পিষে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, পিছনের চাকায় লেগে ভুলির পিছনের দুটি পা ভেঙে গেছে। একটানা আর্তনাদ করতে করতে ভুলি সামনের পা দুটির সাহায্যে দেহটাকে কোনোমতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জগতের দোকানের সামনে।

গাড়িটা যথাস্থানে রেখে ঈশ্বর ফিরে এলে জগত তাকে কটু একটা গাল দিল। গোবর্ধন প্রায় আর্তনাদ করেই বলল, 'তোর কি চোখ নেই? অরে অ খুনে ব্যাটা, তোকে কি চোখ দ্যায় নি ভগ্‌মান্‌!'

ঈশ্বর কারো কথায় জবাব দিল না, পটলকে ধরে আথালি পাথালি মারতে আরম্ভ করল।

'শূয়ার বাচ্চা, চোখ নেই তোর? বলতে পারলি নি মোকে? ইঞ্জিন ঘেঁষে ওরা ছিল, মোর সেথা নজর যায়?'

শ্রীমন্তসহায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'রাখো তোমাদের ঝগড়া। এটার কি করা যায়। কোলে করে গাঁয়ে নিয়ে যাই?'

ঈশ্বর বলল, 'ও বাঁচবে না।'

শ্রীমন্তসহায় হঠাৎ যেন কাবু হয়ে গেছে। ভিজে গলায় বলল, 'তবু একটা দুটো দিন যা বাঁচবে—'

বাসে স্টার্ট দেবার হাতলটা নিয়ে ঈশ্বরকে এগিয়ে আসতে দেখে সে থেমে গেল। জগত চিৎকার করে উঠল, 'খপর্দার! তুমি আমার কুকুরের গায়ে হাত দিও না।'

মোটা থম্বি হাতে জগত ঈশ্বরকে মারতে আসছিল, শ্রীমন্তসহায় তাকে

জড়িয়ে ধরে আটকে রাখল। লোহার হাতলের একটিমাত্র আঘাতে ভুলির আর্তনাদ একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে সে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এই ঠিক হয়েছে ভাই।'

খন্তি কেড়ে জগতকে শান্ত করে আবার সে বলল, 'জানি সব, ভুলে থাকি। গাঁয়ের বাইরে যাওয়া বারণ। কাঠপোড়া যত শুকনো গাঁ হোক ভাই, বাঙ্গলা দেশের গাঁ। রসে একদম টইটুম্বুর। একটা মোটে মামী মশায়—পরিবারটিকে শ্বশুরব্যাটা পাঠাই পাঠাই করে পাঠাচ্ছে না—একটা মামীর স্নেহ লেগে লেগে মনটা আঠার মত চটচটে হয়ে গেছে, কি বলব আপনাকে!'

শ্রীমন্ত সহায় সকলকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে বসিয়ে দণ্ডধারীর বাড়ির কাছে গিয়ে একবার শুধু ডেকেছে, মামী বেরিয়ে এসে দেহের মত মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কজন খাবে র‍্যা ছিমন্ত?'

কজন খাবে? সেটাতো হিসাব করে নি শ্রীমন্ত সহায়। মামী চটে বললেন, 'কজন খাবে না জানলে কি করে রাঁধব শুনি? দশ জনের কম পড়াটা ভালো, না দশজনেরটা নষ্ট হওয়া ভালো? কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি মামাকে তুই মারতে পারিস।'

ঈশ্বর মনে মনে হিসাব করছিল।

'আজ্ঞে, আমরা একুশ জনা খাব। উনিশ প্যাসেঞ্জার আর আমরা দুজন। তারপর ছিমন্তবাবু আছেন'—

শ্রীমন্তসহায় যোগ দিল, 'গোবর্ধনও খাবে। ওর কুমড়োটা নেওয়া হল, ওকে দিতে হবে।'

মামী তার বিধবা বোনকে নিয়ে অল্পদূরে শ্রীমন্তসহায়ের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। উঠানের বড় চুলোটায় দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠল, উনানে একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি চাপান হল। শ্রীমন্তসহায়ের বাপের আমলের হাঁড়ি! দশ বছর বাদে হাঁড়িটা শুধু ধুয়ে নেওয়া হয়েছে, মেজে

ঘষে নেবার সময় কোথায়!

না ডাকলেও গাঁ থেকে খিচুড়ি খেতে এল গাঁয়ের প্রায় তিনভাগ লোক, মেয়ে এবং পুরুষ তার মধ্যে কয়েকজন শুধু ভাণ করে বলল যে তারা শুধু ব্যাপারখানা দেখতে এসেছে। বাকী সকলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল, কারো কারো মাথাটা শুধু নিচু হয়ে রইল আগাগোড়া। ঈশ্বর চুপি চুপি শ্রীমন্ত সহায়কে বলল, 'পেট ভরে খাওয়া কি সইবে এদের? কাল সব কটার না অসুখ করে।'

পেট ভরে খিচুড়ি খেল গোবর্ধন, তার কুমড়ো ভাজা দিয়ে। বহুকাল একবারও এমন পেটভরে খাওয়া তার জোটেনি, শরীরটা ক্রমে অবশ থেকে অবশতর হয়ে আসতে লাগল। সকলের শোবার ব্যবস্থা করার কাজটাতে ফাঁকি দিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। ভরা পেট, অলস দেহ, ঘুমের আবেশ কিছুতেই কিন্তু তার মনে একটি কাঁটার খচখচানি বন্ধ করতে পারল না। গুণমতী গুড় মুড়ি পাঠায় নি। একবেলা সে আধপেটা ভাত খায়, ঘরে কিছু মুড়ি থাকলেও গুণমতী একমুঠো তার স্বামীকে পাঠায় নি!

'মুড়ি পাঠাস্ নি যে?'

'পাঠাই নি! মিছে বলে কি গো! নাম্বুকে দিয়ে পাঠালাম যে?' নাম্বুকে দিয়ে গুণমতী তবে মুড়ি পাঠিয়েছিল? পেটের জ্বালায় নাম্বুই সেটা খেয়ে ফেলেছে? অসংখ্যবার ক্ষুধার জ্বালা সয়ে সয়ে জ্বালাটা ভুলে যাবার অভ্যাস জন্মে গেছে গোবর্ধনের। আজ সন্ধ্যার অসহ্য জ্বালাটাও সে ভুলে গিয়েছিল। তার শুধু জ্বালা ছিল অভিমানের, সেটা মিটে যেতে গোবর্ধন গভীর তৃপ্তি বোধ করল।

ঘুম আসতে কিন্তু তার দেরি হল অনেক। কতকাল পরে পেটভরা খাওয়া! চোখ বুজে ঝিম ধরে পড়ে থাকলেও একটু চেতনা তার সজাগ হয়েই রইল।



রাত দশটায় মেনকা ঘরে এল। এ বাড়িতে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুকে যায়।

ছোট ঘর, চওড়ার চেয়ে লম্বায় দুহাতের বেশি হবে না। মেনকার বিয়েতে মেনকার স্বামী গোপালকে দেওয়া খাটখানাই ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে। খাটের সঙ্গে কোণাচেভাবে পাশ কাটানোর কৌশলে পাতা আছে গোপালের ক্যাম্পচেয়ার, চারিদিকেই চেয়ারটির পাশ কাটিয়ে চলাফেরা সম্ভব। সামনে ছোট একটি টুলে পা উঠিয়ে এই চেয়ারে চিৎ হয়ে গোপাল আরাম করে, বিড়ি মেশাল দিয়ে সিগারেট খায় আর বই পড়ে। পপুলার বই—উঁচুদরের বই যাঁরা লেখেন তাঁদের

পর্যন্ত—যে-বই পড়ে সময় কাটিয়ে মনকে বিশ্রাম দিতে হয়। ঘরের এককোণে ট্রাঙ্ক ও সুটকেশ, স্টিল, চামড়া আর টিনের। ট্রাঙ্কটি মেনকার বিয়ের সময় পাওয়া। রঙ এখনো উজ্জ্বল, তবে কিসে ঘা লেগে যেন একটা কোণ থেবড়ে গেছে। দেয়ালে কয়েকটি বাজে ছবি আর মেনকা ও গোপালের বড় একটি ফটো টাঙানো। শাড়ী, শাড়ী পরার ঢং, গয়নার আধিক্য আর চুল বাঁধার কায়দা ছাড়া ফটোর মেনকার সঙ্গে যে মেনকা ঘরে এল তার বিশেষ কোনো তফাৎ চোখে পড়ে না। গায়ে একটু পুরন্ত হয়েছে মনে হয়, আবার সন্দেহও জাগে। ফটোর গোপালের চেয়ে ক্যাম্পচেয়ারের গোপাল কিন্তু অনেক রোগা। এতে ফটোর কোন ফাঁকি নেই, বিয়ের পর সত্যই গোপাল রোগা হয়ে গেছে। বিয়ে করার জন্য অথবা চাকরি করার জন্য বলা কঠিন, চাকরি আর বিয়ে তার হয়েছে প্রায় একসঙ্গে।

ঘরে এসে দরজায় খিল তুলে দিয়ে মেনকা সেমিজ ছাড়ল। খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসে জোরে জোরে পাখা চালিয়ে বলল, 'বাবা, বাঁচলাম।'

গোপাল বই নামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সায় দেওয়া হাসি একটু হাসল। তারপর আবার বই তুলে নিল।

'উঃ মাগো, সেদ্ধ হয়ে গেছি একেবারে।'

এবার গোপাল বই নামাল না, পড়তে পড়তেই বলল, 'বিশ্রী গরম পড়েছে।'

'টেবল ফ্যানটা তুমি আর কিনলে না।'

'তুমি শাড়ীটা না কিনলে—'

'ন্যাংটো হয়ে তো থাকতে পারি না।'

পাখার হাওয়া গায়ে লাগাতে তাই সে এরকম হয়ে আছে। ঘর যেন

নির্জন, একজোড়া চোখও যেন ঘরে নেই। তিনমাস বাপের বাড়িতে কাটিয়ে সাতদিন আগে এখানে এসেছে। প্রথম দিন এভাবে হাওয়া খেতে পারে নি। ছি, লজ্জা করে না মানুষের! একদেহ, একমন, এক-প্রাণ যারা, তিন মাসের ছাড়াছাড়ি তাদের এমনি করে দেয়, দেখা হওয়ামাত্র চট্ করে এক হয়ে যেতে পারে না। তিনমাস তারা পরস্পরকে কল্পনা করেছে, কামনা করেছে, ব্যথা আর ব্যর্থতার নিশ্বাস ফেলেছে, মুক্তির আস্বাদ আর স্বাধীনতার গৌরবে আনন্দ অনুভব করেছে শান্তির মতো, রাত জেগেছে, আবেগের চাপে সময় সময় দম যেন আটকে এসেছে কয়েক মুহূর্তের জন্য। কত অভিনব পরিবর্তন ঘটেছে দুজনের মনেই দুজনের। দেখা হবার পর আবার একদেহ, একমন, একপ্রাণ হতে খিল দেওয়া ঘরে একটা রাতের, অন্ততঃ আধখান বা সিকিখানা রাতের, সময় লাগবে বৈকি। যন্ত্রের পার্টস খুলে আবার ফিট করতে পর্যন্ত সময় লাগে—বিধাতা মিস্ত্রী হলেও লাগে।

শরীরের ঘাম শুকিয়ে গেলে মেনকা পুবের দুটি পর্দা লাগানো জানালার একটিতে গিয়ে দাঁড়াল। পাশের একতলা বাড়ির ছাতে গরম জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। তার পরের তেতালা বাড়ির সাতটা জানালা দিয়ে ঘরের আলো বাইরে আসছে। আজকাল কখন সবগুলি জানালার আলো নেভে কে জানে! বিয়ের পর কিছুদিন এ-খবরটা সে জানত। চারটে জানালা অন্ধকার হত প্রায় এগারটায়, দুটি হত বারটার কাছাকাছি, আর তেতালার কোণের জানালাটি নিভতো রাত দেড়টা দুটোর সময়। ওই ঘরটিতে কে বা কারা থাকে তাই নিয়ে সে কত কল্পনাই করেছে। অন্য সম্ভবপর কল্পনাগুলি তার মনে আমল পেত না, পরীক্ষার পড়া করতে ও ঘরে কাউকে রাত জাগতে দিতে সে রাজী ছিল না, তার কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল তেতালার ওই কোণের ঘরটিতে তাদের মতো এক দম্পতি থাকে, বিয়ে যাদের হয়েছে অল্পদিন। তাদের মতো

ভালোবাসতে বাসতে কখন রাত দুটো বেজে যায় ওদেরও খেয়াল থাকে না। তারা অবশ্য আলো নিভিয়ে দেয় অনেক আগেই। বাড়ির ভেতরের দিকে তাদের জানালাটি শুধু ঘষা সার্সির, ঘরের মধ্যে নজর চলে না কিন্তু আলো জ্বলছে কিনা জানা যায়। ওদের তেতালার কোণের ঘরটিতে হয়তো আলো জালিয়ে রাখার অসুবিধা নেই।

বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার দিন তারা প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিল। কিন্তু সেদিন ও বাড়ির জানালার দিকে তাকাতে খেয়ালও হয় নি। মেনকা আপন মনে আপশোষের অস্ফুট আওয়াজ করল। সে রাত্রে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। একরাত্রে সব একঘেয়ে হয়ে গেল, বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে একটানা ছমাস একসঙ্গে কাটিয়ে যেমন হয়েছিল।

ঘুম আসছিল। আপশোষটাই যেন ঘুম কাটানোর বেশি কি করে দিয়ে গেল মেনকার। স্তিমিত চোখের একটু চমক আর পিঠের ঠিক মাঝখানে মৃদু শির শির। গোপাল মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। পড়ায় বাধা দিলে সে বড় বিরক্ত হয়। কিছু বলে না, কিন্তু বিরক্ত হয়।

বিছানায় ফিরে গিয়ে মেনকা ইতস্তত: করে, যতক্ষণ না তার মনে পড়ে যায় যে বেশি রাত জেগে বই পড়লে গোপালের মাথা গরম হয়ে যায়। ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বড় জালাতন করে গোপাল। মনে হয়, শান্ত সুবোধ মানুষটা যেন বদলে গেছে, মদ খেয়েছে। এমন বিশ্রী লাগে মেনকার, এমন রাগ হয়! সে কি পালিয়ে যাবে? পরদিন সে কি ঘরে আসবে না? দিনের পর দিন? ঘুম ভাঙিয়ে একটা মানুষকে কষ্ট দেওয়া কেন—যার শরীরও ভালো নয়! অথচ সে যদি কোনো দিন দরকারী কথা বলতে মাঝরাতে গোপালের ঘুম ভাঙায়—যেদিন কোনো অজানা কারণে তার নিজের ঘুম আসে না অথবা হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনটা অদ্ভুত রকম খারাপ

লাগে আর সমস্ত শরীরটা অস্থির অস্থির করায় ছটফট করতে ইচ্ছা হয় —গোপাল শুধু বলে, কাল শুনব, সকালে শুনব !
তবু যদি সে নিজকে তার বুকে গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে করতে করুণ সুরে বলে, 'ওগো শুনছো ? বুকটা কেমন জ্বালা করছে।'
'একটু সোডা খাও', বলে সে পাশ ফিরে বালিশটা আঁকড়ে ঘুমোতে থাকে। তখন মেনকার বুকটা সত্যি জ্বালা করে। নমাসে ছমাসে একটা রাতে হয়তো এরকম ঘুম আসে না অথবা এভাবে ঘুম ভেঙে যায়—হলই বা তা অম্বলের জন্য, কথা কইবার একটা সে লোক পাবে না, পাওনা আদরের একটু তার জুটবে না এই ভয়ানক দরকারের সময়।
ইতস্ততঃ করার কয়েক মিনিটে আবার ঘুমটা ফিরে এসেছিল, হাই তুলে মেনকা বলল, 'শোবে না ? এত যে পড়ছ, চোখ তো আবার কট কট করবে কাল ?'
গোপাল বলল, 'চ্যাপ্টারটা শেষ করেই শোব, পাঁচ মিনিট।'
মেনকা শুয়ে চোখ বুজল। ঘুমে শরীর অবশ হয়ে আসবার আরাম অনুভবের ক্ষমতাটুকু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, বই ফেলে টুল ঠেলে চেয়ার সরিয়ে গোপালের উঠবার শব্দে একটু সচেতন হয়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে একবার গোপালের মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চোখ বুজল। গোপালের মাথা গরম হয় নি, ঘুম পেয়েছে। এক নজর তাকালেই মেনকা ওসব বুঝতে পারে। গোপালের চোখ মুখের সব চিহ্ন আর সঙ্কেত তার মনের মুখস্ত হয়ে গেছে।
আলো নিভিয়ে মেনকার পা মাড়িয়ে গোপাল নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।
মেনকা জড়ানো গলায় শুধোল, 'কাল ছুটি না ?'
গোপাল জবাব দিল, 'হুঁ।'
দুজনে মিনিট দশেক ঘুমিয়েছে, এমন সময় ট্যাক্সি করে বাড়িতে এল

অতিথি। একেবারে পর নয়, সস্ত্রীক গোপালের ভায়রাভাই-এর ভাই রসিক। গত অগ্রহায়ণে রসিক বিয়ে করেছে। বৌকে বাপের বাড়ি রেখে আসবার জন্ত আজ বারটার গাড়িতে তারা রওনা হয়েছিল, সাড়ে ছটায় কলকাতা পৌঁছে আবার রাত নটার গাড়ি ধরবে। অ্যাক্সিডেন্টের জন্ত লাইন বন্ধ থাকায় তাদের গাড়ি কলকাতা এসেছে দশটার সময়। এত রাত্রে কোথায় যায়, তাই এখানে চলে এসেছে। নইলে এতরাত্রে কোন খবর না দিয়ে—

'মনে করে যে এসেছো, এই আমাদের ভাগ্যি!'

স্টোভ ধরিয়ে মেনকা লুচি ভাজতে বসল, গোপালের ভাই সাইকেল নিয়ে বার হল খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে। অন্ততঃ চার রকমের ছানার খাবার আর রাবড়ি আনবে, মোড়ের পাঞ্জাবী হোটেল থেকে আনবে মাংস। ঘরে ডিম আছে, মেনকা মামলেট বানাবে। বাড়িতে কুটুম এসেছে, নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় একটু সমারোহ করা গেল না, ছি ছি।

তবে কাল বিকেলে ওদের গাড়ি, দুপুরে ভালোরকম আয়োজন করা যাবে। মাসের শেষে টাকা ফুরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কুটুম বাড়িতে এলে টাকার কথা ভাবলে চলবে কেন!

পিসীমাকে মেনকা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'একখানা ভালো কাপড় তো বৌকে দিতে হবে, না পিসীমা?'

'দেওয়া তো উচিত।'

বাড়িতে হঠাৎ অতিথি আসার উত্তেজনা ছাপিয়ে গোপালের জন্ত এবার মেনকার মমতা জাগে। আবার এ মাসে বেচারীকে টাকা ধার করতে হবে। একটা মানুষ, খেটে খেটে মরে গেল, ভাই বোন মাসী পিসী সবাই লুটেপুটে তার রোজগার খাচ্ছে। তার ওপর আবার কুটুমের এসে অতিথি হাওয়া চাই। একটা টেবল ফ্যান কেনার সাধ পর্যন্ত বেচারার

মেটে না। সেই বা কেমন মানুষ, ঘেমেচেমে আফিস থেকে ফিরলে দশমিনিট একটু হাওয়া পর্যন্ত করে না তাকে! আজ রাত্রে পাখার বাতাস দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে তবে সে ঘুমোবে। এক হাতে হাওয়া করবে, অন্য হাতে মাথার চুলে—

রসিক খেতে বসল ঘেরা বারান্দায়, রসিকের বৌকে বসানো হল ঘরে। রসিকের কাছে বসলেন পিসীমা, তার বৌয়ের ডাইনে বাঁয়ে গা ঘেঁসে বসল মেনকার দুই ননদ। পরিবেশন করতে করতে মেনকা লক্ষ্য করল, এদিকে ওদিক নড়েচড়ে বেড়াতে বেড়াতে গোপাল রসিকের বৌকে দেখছে, আগ্রহের সঙ্গে দেখছে। প্রথমে রসিকের বৌকে দেখে গোপাল যেন একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। আলাপ করতে গিয়ে লজ্জায় তাকে কাবু হয়ে পড়তে দেখে যেন একটু আহত হয়েছিল। সহজ একটা ঠাট্টায় তাকে ফিক্ করে হাসিয়ে কথা বলাতে পারায় খুশির যেন তার সীমা ছিল না। লুচি ভাজতে ভাজতে এসব মেনকা লক্ষ্য করেছে। এখন দুজনের খাওয়া তদারকের ছুতোয় ক্রমাগত বারান্দা থেকে ঘরে গিয়ে চোখ বুলচ্ছে রসিকের বৌ-এর সর্বাঙ্গে। অন্য কারো চোখে পড়বার মতো কিছু নয়। অন্য কারো সাধ্য নেই গোপালের চলাফেরা আর হাসিমুখে মানানসই কথা বলার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আবিষ্কার করে। মেনকার মতো চোখ তো ওদের কারো নেই। কিন্তু গোপাল এরকম করছে কেন? রসিকের বৌ সুন্দরী বলে? মেয়েটার রূপ আছে, একটু কড়া ধাঁচের রূপ। যে রূপ কাপড় জামায় বিশেষ চাপা পড়ে না, বরং আরও উগ্র, আরও অশ্লীল হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তার লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির মানুষ সশঙ্ক অবস্থায় দিন কাটায়। আর রূপের অহঙ্কারে রূপসীটির মাটিতে পা পড়ে না।

গোপাল শান্ত, ভদ্র, মিষ্টি রূপ ভালোবাসে—মেনকার মতো রূপ। রসিকের বৌকে দেখে তার তো বিচলিত হবার কথা নয়।

ঘরে গিয়ে একটু খোঁচা দিতে হবে। বুঝতে হবে ব্যাপারখানা কি।

অতিথিদের খাওয়া শেষ হতেই তাদের শোয়ার সমস্যা নিয়ে পিসীমা, মেনকা আর গোপালের পরামর্শ হল।

পিসী বললেন, 'ভূপাল আর কানাই এক বিছানায় শোবে। ওর বৌকে অহুবিহুদের ঘরে দেওয়া যাক। একটা রাত তো।'

গোপাল বলল, 'না না, তাই কি হয়! নতুন বিয়ে হয়েছে, ওদের একটা ঘর দেয়া উচিত। ওরা আমার ঘরে থাকবে।'

পিসীমা ঢোঁক গিলে বললেন, 'তবে তাই কর।'

তারপর রাত একটায় বাড়ির সব আলো নিভল। গোপাল শুল ভূপালের ছোট চৌকির ছোট বিছানায়, মেনকা শুল অহুবিহু দুই ননদের মাঝখানে। রাত্রিবেলা একান্ত দুর্লভ বৌদিকে ঘটনাচক্রে কাছে পেয়ে অহুবিহুর আহ্লাদের সীমা নেই। না ঘুমিয়ে সারারাত গল্প করবে ঘোষণা করে মিনিট দশেক ফোয়ারার মতো এবং তারপর আরও দশ মিনিট ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলে আধ ঘণ্টার মধ্যে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। মেনকা রইল জেগে। গোপালকে তার কত কথা বলার ছিল, কিছুই বলা হল না। আজকের রাতটা কাটবে, এই দীর্ঘ অফুরন্ত রাত, তারপর সারাটা দিন যাবে, কিছুতে কাটতে চায় না এমন একটা দিন, রাত দশটায় সে গোপালের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাবে। ততক্ষণে বাসি হয়ে যাবে সব কথা। বলার কোনো মানে থাকবে না। তাছাড়া, পিসীমা কাল ওদের এখানে থেকে যেতে বলেছেন। কাল দিনটা বড় খারাপ, যাত্রা শুভ নয়। রসিকেরা হয়তো কালও এখানে থেকে যাবে, রাত্রে দখল করবে তার ঘর। তাহলে সেই পরশু রাত্রের আগে গোপালকে সে আর কাছে পাচ্ছে না। কি হতচ্ছাড়া একটা বাড়িই গোপাল নিয়েছে, একটা বাড়তি ঘর নেই। বাড়তি ঘর থাকবেই বা কি করে? তাই বোন মাসী পিসীতে বাড়ি গিজ গিজ করছে।

গোপালের দোষ নেই, এই বাড়ির জন্যই মাসে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া গুনছে। সকলের সুখের জন্য খেটে খেটে সারা হয়ে গেল. মানুষটা। একটু রোগাও যেন হয়ে গেছে আজকাল।

নিশ্চয় রোগা হয়ে গেছে। পর্শু যখন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, কই, আগের মতো জোরে তো ধরে নি! কাছে থাকলে আজকেই পরখ করা যেত কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাল সকালে চেয়ে দেখতে হবে গোপালের চেহারা কেমন আছে। কাল থেকে একটু বেশি মাছ দুধ খাওয়াতে হবে তাকে।

এখন গিয়ে যদি একবার দেখে আসে? ভূপাল আর কানাই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আলো জ্বালালে যদি ওদের ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে গায়ে হাত বুলোতে গেলে গোপাল যদি জেগে যায়।

আজ রাত্রে কিছু হয় না। আজ সে ফাঁদে পড়ে গেছে। হার্টফেল করে এখন সে যদি মরেও যায়, গোপালের একটু আদর পাবে না। কোনো উপায় নেই, কোনো ব্যবস্থা করা যায় না। একটা বাড়তি ঘর যদি বাড়িতে থাকত! রাত্রির স্তব্ধতা মেনকার কানে ঝমঝম্ শব্দ তুলে দেয়। ছুতো আর কৈফিয়তের আশ্রয় ছেড়ে, যুক্তি আর সঙ্গতির স্তর অতিক্রম করে, চিন্তা তার সোজাসুজি স্পষ্টভাবে গোপালকে চেয়ে বসে। পুরানো অভ্যস্ত মিলনের পুনরাবৃত্তি। তারপর মেনকা মরে যেতে রাজী আছে।

'শুনছো?'

একসঙ্গে শীত আর গ্রীষ্ম অনুভব করে মেনকা শিউরে উঠল।

জানালার দিকে মুখ ঠেকিয়ে গোপাল গলা আরেকটু চড়িয়ে বলল, 'ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটা অ্যাস্পিরিন দিয়ে যাও।'

মেনকা সাড়া দেবার আগেই ঘরের এক প্রান্ত থেকে পিসীমা বললেন, 'কে রে, গোপাল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

'না গরমে মাথা ধরেছে। অ্যাস্পিরিন খাব। তুমি উঠো না। উঠো না কিন্তু পিসীমা। তোমার উঠে কাজ নেই।'
মেনকা দরজা খুলে বেরিয়ে এল।
'অ্যাস্পিরিন যে ঘরে রয়েছে?'
'তবে অ্যাস্পিরিন থাক। ছাতে গিয়ে একটু শুই। ভুপালদের ঘরটা বড় গরম।'
'খোলা ছাতে শোবে। অসুখ করে যদি?'
'কিছু হবে না। একটা পাটি বিছিয়ে দাও।'
ঘর থেকে মেনকা পাটি আর বালিশ নিয়ে এল—একটি বালিশ। বারান্দা পার হয়ে ছাতের সিঁড়ির দিকে যাবার সময় তাদের ঘরের সামনের সার্সির জানালার কাছে তাকে দাঁড় করিয়ে গোপাল চুপিচুপি বলল, 'দেখেছ? এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে!'
সার্সি অন্ধকার। রসিকের নাক ডাকার শব্দ বাইরে শোনা যাচ্ছে। মেনকা বলল, 'ঘুমোবে না? রাত কি কম হয়েছে!'
ছাতে পাটি বিছিয়ে মেনকা বালিশ ঠিক করে দিল। গোপাল শুধোল, 'তোমার বালিশ আনলে না?'
'আমিও শোব নাকি এখানে?'
গোপাল হাত ধরতেই সে পাটিতে বসে পড়ল।—'সবাই কি ভাববে!'
গোপাল জড়িয়ে ধরতে কিছুক্ষণ তার শ্বাস বন্ধ হয়ে রইল।—'আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। একটা বালিশেই হবে'খন।'
তেতালা বাড়ির কোণের সেই ঘরের জানালাটা আলিসার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। এখনো ও-ঘরে আলো জ্বলছে। ৩৩৭

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর
বহু-প্রশংসিত অনুবাদ
আধুনিক সোভিয়েট গল্প

সোভিয়েট রাশিয়ার ১২জন বিখ্যাত লেখকের ১২টী বিশিষ্ট গল্পের ঝরঝরে বাঙলায় নিখুঁত অনুবাদ।

লেখকের কাজের শেষ লেখাতে নয়, শেখাতে। তার কলম হচ্ছে অস্ত্র, প্রহরণ। শুধু তার কল্পনা চুলকোবার জন্য নয়, খোঁচা মেরে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্য। কাটতে হবে তাকে খাল খুঁড়তে হবে তাকে খনি। তার জীবনে যেমন উদ্দেশ্য আছে, তেমনি সাহিত্যেও থাকবে সেই উদ্দেশ্য। সূর্য শুধু অন্ধকারের উচ্ছেদ করে না, আনে প্রাণস্রোত, শ্যামল সমুচ্ছাস। শুধু দগ্ধ করে না, পূর্ণ করে। তাই সাহিত্যকে লাগাতে হবে শোভনের কাজে নয়, গঠনের কাজে, অঘটনপ্রকটনের কাজে, বিকাশে-বিলাসে নয়, স্থাপনে-বিন্যাসে, একচ্ছত্র সমাজতন্ত্রের প্রচারে-প্রসারে। সাহিত্যকে হতে হবে সজ্ঞান, সত্যসন্ধ। উদ্দেশ্য-প্রেরিত।—সোভিয়েট সাহিত্যের এই মূল সুর। আর এই সুর বিভিন্ন আধুনিক সোভিয়েট লেখকের হাতে কত কী নতুন ভাবে বেজেছে তাই প্রকাশিত এই গল্প সঞ্চয়নে।

ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন—

"বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের উৎকর্ষতা এখনো দেখা দেয়নি। সম্প্রতি সিগনেট প্রেসের প্রবর্তনায় রুশ-গল্পসাহিত্যের যে-তর্জমা বেরিয়েছে তার বিশেষত্ব এই যে বাঙালি কথাশিল্পীর হাতে তার নিছক বাঙালি

একটি সাহিত্যরূপ প্রকাশিত হলো অথচ গল্পগুলি মূল রচনা হতে দূরে-সরে যায়নি রাশিয়ান ভাষা না জেনেও তা বোঝা যায়। বাংলায় তর্জমা সাহিত্যের যে-নূতনরূপ উদ্ঘাটিত হলো তাকে আমরা সাদরে আহ্বান ক'রে নেব। আমাদের সাহিত্যের ধারা এতে সমৃদ্ধতর হয়ে এগিয়ে চলবে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"বিপ্লবোত্তর রাশ্যা সোভিয়েট ইউনিয়ান জগতের কাছে এক রহস্যময় দেশ হয়ে উঠেছিল। একদিন সমগ্র ধনতান্ত্রিক পৃথিবী তাকে ঘৃণায় আতঙ্কে একঘরে করে রেখেছিল এবং তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বহু ভয়াবহ তথ্য এবং কাহিনী প্রচার করেছিল। অন্যদিকে পৃথিবীর সাম্যবাদী সম্প্রদায় প্রচার করেছে তার ঠিক বিপরীত কথা। আজ মহাযুদ্ধের মধ্যে রাশ্যা এক বিস্ময়কর শক্তিধররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বিশ্বজগতের সম্মুখে। নিন্দা প্রশংসার পটভূমিকায় রাশ্যার এই বিস্ময়কর মূর্তির স্বরূপ খুঁজে পেতে হলে তার সাহিত্যের মধ্য থেকে তাকে আবিস্কার করতে হবে। তাই সিগনেট প্রেসের প্রবর্তনায় সোভিয়েট ছোট গল্পের যে অনুবাদ হয়েছে তাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—

"নতুন রাশিয়ার নতুন গল্প। কিন্তু সেই পুরাণো দিকপালদের কলম দিয়েই লেখা। সেই বলিষ্ঠ বিশালতা গল্পের গাঁথুনীতে, সেই সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য গল্পের বুনুনীতে। অনুবাদেরও বাহাদুরী। দেশান্তরে মন ঘুরে বেড়ায়, ভাষান্তর টের পায় না।"

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—

"আজকের দিনে এরকম একটি বইয়ের প্রয়োজন ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রুশ সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট: গোগল থেকে গোর্কি পর্যন্ত

একটি আনন্দের সুবর্ণ স্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে এমন ভাবে প্রবাহিত হয়ে গেছে যে তার স্মৃতি আমাদের সাহিত্যেও তার চিহ্ন রেখে গেছে। রুশ সাহিত্যের সেই গৌরবময় ইতিহাস যে রুদ্ধ হয়ে যায়নি এই বইটি তারই দলিল। অনুবাদ করেছেন অচিন্ত্যকুমার, তাই সে-বিষয়ে কিছু না বললেও চলে।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"বাস্তবের তীব্র তীক্ষ্ণ কড়া মোটা বিভৎস সুন্দর এলোমেলো সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বজায় রাখা কল্পনার গতিবেগের দ্রুততা মনকে দোলা দেয়, ভাবায়। চিন্তায় প্রবাহ রেখে যায়, অনুভূতিতে স্বাদ।"

সজনীকান্ত দাস বলেছেন—

"বাংলা ভাষায় লিখিত আধুনিক কয়েকটি গল্প ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করে চমৎকার ভাবে সমগ্র পৃথিবীর দরবারে প্রচার করে সিগনেট প্রেস যেমন একদিকে পৃথিবীর সাহিত্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ন্যায্য অধিকার স্থাপন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসাদি বাংলায় ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করে বাংলার সাহিত্য রসিকদের সামনে একটা সার্বজনীন আদর্শও ধরে দিচ্ছেন। এই শেষোক্ত উদ্যম সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে রূপ নিয়েছে 'আধুনিক সোভিয়েট গল্পে'। গল্পগুলির নির্বাচন এবং অনুবাদ এমন যত্ন করে করা হয়েছে যে এগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হবার যোগ্যতা অর্জন করবে। বাংলা সাহিত্যের একজন সেবক হিসাবে সিগনেট প্রেসের এই উদ্যোগে বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠেছি। এরকম দেওয়া নেওয়ার ব্যাপক চেষ্টা আর কেউ আগে এমন ভাবে মুদ্রণ এবং বহির্বাসের দিকে নজর রেখে করেন নি। এতে বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রকাশকদের শ্রদ্ধাই সূচিত হচ্ছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা আরম্ভ হয় তার পরিণতি সাফল্যের মধ্যে। এই সাফল্য সিগনেট প্রেস নিশ্চয় অর্জন করবেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছেন—

"সমসাময়িক সোভিয়েট রাশিয়ার নবীন লেখকদের কতগুলি বাছাই করা ভাল গল্প, খ্যাতনামা সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার অনুবাদ করিয়াছেন। বিদেশী ভাবা ও ভাবকে এমন সুন্দরভাবে রূপান্তরিত করিবার মুন্সীয়ানা অচিন্ত্যকুমারের আছে বলিয়াই বইখানি এমন সুখপাঠ্য হইয়াছে।"

সুবোধ ঘোষ বলেছেন—

"নব্য রুশের মানুষের কাজের ও প্রেমের জীবনে যন্ত্র কত অন্তরঙ্গ হয়েছে—লেও ভাইসেনবার্গের "ঘুম ভাঙানো ঘড়ি" তারই প্রমাণ। এই নতুন প্রেমের গল্প পড়লেই ফুরিয়ে যায় না। এর প্রেরণা ঠিক সময়মত বেজে ওঠে, প্রতি প্রভাতে, নতুন জ্যোতির ছন্দে।"

"অরণি" বলেছেন—

"পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাহিত্য আজ এক অসম্ভব অবস্থায় গিয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে যোগ নেই, জীবন সম্বন্ধে উৎসাহ নেই, নৈরাশ্যের পাহাড় শুধু। এ দুর্গতি রুশ-লেখকদেরও হয়তো হত কিন্তু তারা মুক্তি পেল বিপ্লবের দমকা হাওয়ায়।.. এ যুগের রুশ সাহিত্য.. শিল্প হিসেবে দুর্মূল্য.. পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পীদের কাছে আশার নতুন আলো আনতে পারে...বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্য থেকে বারোটি গল্প বাছাই করে অচিন্ত্যকুমার তর্জমা করেছেন। তর্জমার দক্ষতা নিয়ে কথাই ওঠে না, আর বাছাইও যে কতখানি সার্থক প্রত্যেক পাঠক তা অনুভব করতে পারবেন। রুশ জীবনের নানাদিক এতে প্রতিফলিত—অনেক ভুল ধারণা ভেঙে যায় এসব গল্প পড়তে পড়তে। এ ধরণের তর্জমা আরো কিছু হলে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাবে।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেছেন—

"সোভিয়েট রুশের নূতন সমাজ সে-দেশের সাহিত্যে কি প্রেরণা দিয়াছে

এবং সাহিত্যই বা কতখানি প্রেরণা জোগাইতেছে, তাহার পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থের বারোটি সুনির্বাচিত গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়…এই সম্পর্কে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখনীর অনুবাদ কুশলতা সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য। স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল অনুবাদের গুণে গল্পগুলির বৈদেশিক অপরিচয়ের আড়ষ্টতা কাটিয়া গিয়াছে…আমরা এই সুন্দর বইখানিকে পাঠক সাধারণের কাছে পরিচয় করাইয়া দিতে আনন্দ বোধ করিতেছি।"

"যুগান্তর" বলেছেন—

"তর্জমায় মূল লেখার সুর ও সৌরভ বজায় রাখা দুরূহ সমস্যা সন্দেহ নাই। অত্যন্ত আনন্দের কথা তর্জমা যিনি করিয়াছেন তিনি পাকা সাহিত্যিক; অনেক বছর উপন্যাস, গল্প ইত্যাদিতে হাত পাকাইয়াছেন। ভাষা তাই ধারাল—তর্জমা বলিয়া মনেই হয় না। সুদূর রাশিয়ার ছবি একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া ওঠে, বিপ্লবের দিনের অত্যাচারের কথা, সংগ্রামের কথা, মেয়েদের প্রথম মুক্তি পাইবার কথা, এই রকম আরো অজস্র কথা, এত স্পষ্ট, এত জলজলে হইয়া ফোটে যে, রুশ সমাজ সম্বন্ধে পাঠকের মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। অচিন্ত্যবাবুর তর্জমা তাই শুধু যে সাহিত্যে দুর্মূল্য হইয়া থাকিবে তা নয়, ইহার সামাজিক অবদানও প্রচুর।"

আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া ছাড়া—হালের সাহিত্য আরো সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে কিনা, কোথায় কী কোণ নিচ্ছে, বাঁক ঘুরছে, তাও দেখা যাবে এই সঞ্চয়নে। এই বইর সঙ্গে পরিচয় না রাখা মানে অগ্রগমনের দিনে পিছিয়ে থাকা। দাম সাড়ে তিন টাকা।

প্রকাশক—সিগ্‌নেট প্রেস
১০।২, এলগিন রোড, কলিকাতা। টেলিফোন, পার্ক ১০৭৫